ধনেপাতা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

মিত্রালয়
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, : : কলিকাতা-১২

— আড়াই টাকা —

১৩৩৮

মিত্রালয় ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে জি, ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও
বঙ্গশ্রী প্রেস ৮০।৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

মানবহৃদয়ের কবি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে—

এই লেখকের

রবীন্দ্র-চর্চা

রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর

রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ ১।২

রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ ১।২।৩

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন

সাহিত্য

মাইকেল মধুসূদন

চিত্রচরিত্র

বাংলার লেখক

বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য

বাঙালীর জীবনসন্ধ্যা

বিচিত্র উপল

নেহরু—ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

উপন্যাস

পদ্মা

কোপবতী

জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার

অশ্বত্থের অভিশাপ

চলনবিল

গল্প

শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব

শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব

গল্পের মতো

গালি ও গল্প

ব্রহ্মার হাসি

ডাকিনী

অশরীরী

প্র, না, বি-র নিকৃষ্ট গল্প

নাটক

পারমিট

ঋণং কৃত্বা

সানি ভিলা

পরিহাসবিজল্পিতম্

ডিনামাইট

গভর্নমেণ্ট ইন্সপেক্টর

মৌচাকে ঢিল

কাব্য

অকুন্তলা

যুক্তবেণী

হংসমিথুন

যন্ত্রস্থ

বাংলা সাহিত্যের নরনারী

অচলিত

দেয়ালি

বসন্তসেনা

আত্মঘাতিনী

প্রাচীন আসামী হইতে

প্রাচীন গীতিকা হইতে

বিদ্যাসুন্দর

দেশের শত্রু

ঘোষযাত্রা

চয়ন

নিবেদন

এই পুস্তকের গল্পগুলির মূল ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে নিবদ্ধ। কোনটিই লেখকের কল্পনাপ্রসূত নয়।

অনেকগুলি গল্পের মূলের সন্ধান গল্পের মধ্যে বা গল্পের শেষে দেওয়া হইয়াছে। 'গুরুমারা চেলা' গল্পটির মূল পাওয়া যাইবে—ভিনসেণ্ট স্মিথ-লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থের জলালুদ্দিন খিলজির প্রসঙ্গে। আর কালিদাস সম্বন্ধীয় গল্প দু'টিতে কালিদাস সম্পর্কে সর্বজনপরিজ্ঞাত তথ্যের বাহিরে বড় যাওয়া হয় নাই; যেখানে যাওয়া হইয়াছে, সেখানেও পরিজ্ঞাত তথ্যের সূত্র অনুসরণ করাই হইয়াছে। তবে সে-সব কাহাকেও ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে বলি না। মোট কথা, এগুলি ইতিহাসের পাত্রে পরিবেশিত কল্পনার পানীয়। এগুলির ঐতিহাসিকতার দাবি সম্বন্ধে ইহার বেশি বলিবার কিছু নাই।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

মহেন্‌-জো-দড়োর পতন

সিন্ধু নদের তীর বরাবর সুদীর্ঘ, সুদৃঢ়, সু-উচ্চ বাঁধ। বালির নয়, পাথরের নয়, প্রাকৃতিক নয়, ছোট মাপের ইঁটের তৈরী; এক সময় মানুষে তৈরী করিয়াছে। কিন্তু কতকাল আগে, কালের দিগন্তে সে স্মৃতি আজ অস্পষ্ট; বাঁধের গায়ে কত দিনের শ্যাওলা। নদীর ঘাত-প্রতিঘাতের কত চিহ্ন, কোন কোন অংশে ভাঙনের ক্ষত, আবার সেখানে মেরামত হইয়াছে।

বহু পুরুষ ধরিয়া মানুষে বাঁধটি দেখিতেছে; লোকে নদীর ঐতিহ্যের যেমন সন্ধান করে না, বাঁধটি সম্বন্ধেও তাই—দুই-ই এখন সকল প্রশ্নের অতীত, দুইটিকেই মানুষে বিনা প্রশ্নে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

বাঁধের একদিকে নদী, অপর দিকে নগর। নগরের দিক্ হইতে মাঝে মাঝে বাঁধে উঠিবার সোপান-শ্রেণী। বাঁধের মাথাটা বেশ প্রশস্ত, ৫।৭ জন মানুষ স্বচ্ছন্দে পায়চারী করিতে পারে, করেও তাই। ওখানে বেড়াইবার একটা স্থান, কত লোকে সকাল বিকাল ওখানে হাওয়া খাইতে বেড়াইয়া থাকে।

আমাদের গল্পের সূত্রপাত ঐ বাঁধটার উপরে। সেখানে দুইজন লোক পাশাপাশি বেড়াইতেছিল, হাওয়া খাইতেছিল—এমন নয়; কারণ, এখনো সান্ধ্য-বিচরণকারী দলের আসিবার সময় হয় নাই।

দু'জন লোকই দীর্ঘকায়, একজনের দাড়ি গোঁফ দীর্ঘ, আর একজনের গোঁফ ছোট করিয়া ছাঁটা, কিন্তু দাড়ি দীর্ঘ; দু'জনেরই চুল লম্বা—সে চুল পিছন দিকে খোঁপার আকারে সজ্জিত, তাহাতে সোনার কঙ্কতিকা (কাঁকই) গোঁজা। বাম কাঁধের উপর, দক্ষিণ বাহুর নীচে দিয়া গায়ের কাপড় জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত, অধোবাস অদৃশ্য। দু'জনাকেই সম্ভ্রান্ত পুরুষ বলিয়া বোধ হয়।

তাহারা নদীর দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিতেছিল—তাহাদের নিকটে দাঁড়াইলে, পূবদিকে মুখ ফিরাইলে দেখা যাইবে নদীর বিস্তৃত প্রবাহ, অনেক নীচে বলিয়া স্রোতোহীন প্রতীয়মান, কিন্তু মাঝে মাঝে দ্রুতগামী নৌকা দেখিলে

স্রোতের প্রচণ্ডতা অনুমান হয়—আবার পশ্চিম দিকে চাহিলে দেখা যাইবে নগরের উচ্চাবচ সৌধতরঙ্গ—দূরে বলিয়া, নীচে বলিয়া দাবার ছকের মতো দৃশ্যমান—তিনতলা বাড়ীগুলোও খেলাঘরের মতো। বাঁধটা কত উচু—আর সম্মুখে পশ্চাতে বাঁধের বিস্তৃত শিরদাঁড়া—দুই দিকের দিগন্তে সূক্ষ্ম সূঁচালো হইয়া যেন মিশিয়া গিয়াছে।

ব্যক্তি দুইজন এবারে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল।

একজন বলিল—এই আমাদের শত্রু, নদীই আমাদের শত্রু, আবার নদীই আমাদের মিত্র।

অপর জন বলিল—শত্রুতা, মিত্রতা—সবই অবস্থার উপরে নির্ভর করে।

পূর্বোক্ত জন বলিল—সেনাধ্যক্ষ, তোমার কথা অর্ধসত্য, সবই নিজেদের উপরে নির্ভর করে।

দ্বিতীয় জন বলিল—পূর্ত-সচিব, তোমার কাজ নদীকে সংযত করা, আমার কথাকেও তুমি সংযত করিয়া যথার্থ রূপ দিয়াছ।

তাহাদের কথোপকথন হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—একজন নগরের সেনাধ্যক্ষ—অপর জন পূর্ত-সচিব, দু'জনেই নগরপ্রধানগণের শ্রেণীভুক্ত।

পূর্ত-সচিব বলিল—এবারে বন্যায় খুব জোর ধরবে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল—কি ভাবে বুঝিলে?

—দেখ না কেন, এখন বর্ষার প্রারম্ভ, ইতোমধ্যেই জল বাঁধের কতটা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তা' ছাড়া, আমি দেখিয়া আসিতেছি যে, পাঁচ বৎসর অন্তর প্রবলতর বন্যা হইয়া থাকে।

—হোক প্রবল বন্যা। তোমার বাঁধ আমাদের প্রহরী।

—প্রহরী প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে—আজ তাহার জীর্ণদশা। এবার বর্ষা-অন্তে বাঁধ মেরামত না করিলেই নয়।

—আমিও তাহাই বুঝি, কিন্তু নগরপ্রধানগণ কি অর্থ ব্যয় করিতে রাজী হইবেন?

—আমারও সেই আশঙ্কা। তাঁহাদের অধিকাংশই বয়সে নবীন, তাঁহারা

নগরের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তাকে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম বলিয়া মনে করেন। বাঁধ মেরামতের প্রশ্ন তুলিলেই তাঁহারা বলিবেন—ওটা পূর্তসচিবের একটা খেয়াল, নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার জন্য কেবল বাজে খরচের বাবদ অর্থ চান! কিন্তু—

—কিন্তু আমরা দু'জনেই বৃদ্ধ, আমরা জানি—হ্রাস বৃদ্ধি, উত্থান পতন, জীবন ও মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম!

—সেই তো বিপদ্! নবীনেরা এসব কথা বুঝিতে চায় না। তাহারা বাঁধ-মেরামতের অনিবার্য অর্থ দিয়া নগরের স্থানে স্থানে দেবলিঙ্গ স্থাপন করিতেছে, অনর্থক ধুমধাম করিয়া অর্থের অপব্যয় করিতেছে। আমাদের সতর্কবাণী তাহারা শুনিতে চায় না।

—ঐ আর এক বিপদ্। আমাদের প্রাচীন মৎস্য-পূজায় এখন আর কাহারো মন নাই। নবপ্রবর্তিত লিঙ্গ-পূজায় এখন সকলেই উন্মত্ত। কিন্তু পূর্ত-সচিব, ভাবিয়া দেখো, সে পূজা কত সরল ছিল, আড়ম্বর ছিল না, আবার আন্তরিকতারও অভাব ছিল না। আর এই মৎস্যদেব তো সিন্ধু নদেরই প্রতীক।

—সেই কথাই তো বলিতে চেষ্টা করিতেছি, নদীর দিক্ হইতে আমাদের মন নগরের দিকে, সরলতার দিক্ হইতে আড়ম্বরের দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। বাঁধের উত্তর দিক্‌টা দেখিয়াছ কি? এবার বর্ষায় যদি টেঁকে—সৌভাগ্য, বর্ষার অন্তে মেরামত না করিলেই দুর্ভাগ্যের চরম হইবে।

—পূর্ত-সচিব, তোমার ঐ উত্তর দিকের প্রসঙ্গে একটি জরুরী বিষয় মনে পড়িল। আমার গুপ্তচরেরা নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের আমি উত্তর দিকের খবর সংগ্রহ করিতেই বিশেষভাবে আদেশ করিয়াছি। একজন দূত দুই শত ক্রোশ অবধি গিয়াছিল। সেখানে একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, সে আগেও সেখানে একবার গিয়াছে। কিন্তু এবারে গিয়া দেখিল, নগরের সে পূর্বসমৃদ্ধি নাই।

—এমন বিপদ্ কেন ঘটিল? বন্যা?

—না।

—অগ্নি?

—না।

—ভূমিকম্প ?

—তবে কি শত্রু ?

—এবারে ঠিক অনুমান করিয়াছ।

—কিন্তু তাহাদের কি সৈন্য ও অস্ত্র ছিল না ?

—ছিল বই কি।

—তবে ?

—আততায়ী মহাশক্তিসম্পন্ন।

—হইলেও মানুষ ছাড়া কিছু নয়।

—সে কথা ঠিক! কিন্তু তাহাদের বাহন এক প্রকার দ্রুতগামী জীব। সেই বায়ুগতি বাহনে চড়িয়া তাহারা অতর্কিতে আসে, অতর্কিতে যায়, পদাতিকে তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কেন ?

—এত সংবাদ দূত রাখিল কি প্রকারে ?

—একবারের আক্রমণের সময়ে সে উপস্থিত ছিল।

—কি সেই জন্তু।

—দূত তাহার একটা ছবি আঁকিয়া আনিয়াছিল।

—ছবিখানা দেখিয়াছ ? দেখিয়া কি বুঝিলে ?

—বুঝিলাম, সে জন্তু তেজস্বী, দ্রুতগামী ; আর বুঝিলাম, এদেশে কেহ তাহা দেখে নাই, এদেশে সে জন্তু নাই !

—কিন্তু দুই শত ক্রোশ দূরের ভয়ে ভীত হইবার তো কারণ দেখি না।

—পূর্ত-সচিব, যে বন্যায় আমরা সর্বদা শঙ্কিত, তাহা তো আরও দূর হইতে আসিয়া থাকে।

—তা বটে।

—আর এমন দ্রুতগামী বাহন যাহাদের, তাহারা কি একটা নগর ধ্বংস করিয়াই ক্ষান্ত হইবে ? সিন্ধুলালিত শ্রেষ্ঠ নগরের সংবাদ কি তাহাদের কানে পৌছিবে না ?

—এ আশঙ্কা মিথ্যা নয়। চলো, আ তামার আবাসে গিয়া সেই অদ্ভুত জীবের ছবিটা দেখিব, সেখানা আছে তো?

—আমি যত্নে রাখিয়া দিয়াছি।

দুইজনে যখন বাঁধ হইতে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তখন একজন নাগরিক ব্যস্তভাবে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, নত হইয়া অভিবাদন করিল; বলিল, নগরপ্রধানগণ শীঘ্র আপনাদের স্মরণ করিয়াছেন।

—কেন হে বাপু?

—তাহা আমি জানি না, তবে কোন বিপদ্ ঘটিয়া থাকাই সম্ভব।

—তাঁহারা কোথায়?

—মুখ্য স্নানাগারের নিকটবর্তী চত্বরে, সেখানে একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

—ভিড়ের মধ্যে কি আছে?

—তাহা আমি দেখি নাই, আমি দূরে ছিলাম।

—আচ্ছা, চলো যাওয়া যাক্।

তখন তাহারা দুইজনে দূতের অনুসরণ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া বাঁধ হইতে নামিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্বোক্ত স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা দেখিল, সত্যই এক বৃহৎ জনতা, চত্বর পূর্ণপ্রায়। তাহাদের দেখিবামাত্র পথাধ্যক্ষ, শকটাধ্যক্ষ এবং আরও ২।৪ জন রাজপুরুষ অগ্রসর হইয়া আসিল, বলিল—আসুন, এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে।

হঠাৎ এমন কি বৈচিত্র্য ঘটিল, বুঝিতে না পারিয়া তাহারা ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল—দেখিল, মাঝখানটা ফাঁক, আর সেখানে দাঁড়াইয়া আছে এক অদৃষ্টপূর্ব জন্তু!

পূর্ত-সচিব বলিল—সেনাধ্যক্ষ, দেখ এক অদৃষ্টপূর্ব জানোয়ার।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আমার একেবারে অদৃষ্ট নয়, এ সেই জানোয়ার।

পূর্ত-সচিব সেনাধ্যক্ষের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সে মুখে পরিহাসের ছায়ামাত্র নাই, দেখিল—অমিতবিক্রম সেই পুরুষের মুখ পাংশু! পূর্ত-সচিবও ভীত হইয়া উঠিল।

ইতোমধ্যে জনতা সেই জন্তুটিকে লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে, কেহ লেজ ধরিয়া টানিতেছে, কেহ খোঁচা মারিতেছে, কেহ বা মুখের কাছে শষ্পমুষ্টি ধরিতেছে, কিন্তু তেজস্বী জন্তুটার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। সে গ্রীবা বাঁকাইয়া দণ্ডায়মান, মাঝে মাঝে নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইতেছে, চক্ষুর শ্বেতাংশ ঘূর্ণিত করিতেছে, দূর পথ-অতিক্রমণে ক্লান্ত বলিয়া বক্ষ কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হইতেছে, আর নিতান্ত বিরক্তি বোধ করিলে লেজটি আন্দোলিত হইতেছে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল—এ জন্তু আসিল কোথা হইতে?

একজন নাগরিক অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—আমার ক্ষেতখামার এখান হইতে দূরে, প্রায় দুই দিনের পথ, সেখানে মাঝে মাঝে গিয়া তদারক করি। এবারেও গিয়াছিলাম, আজ সকালে উঠিয়া দেখি, জানোয়ারটা ক্ষেতের শস্য খাইতেছে, তখন—

—দাঁড়াও। দু'দিনের পথ তুমি একদিনের মধ্যে আসিলে কি প্রকারে?

—উহার পিঠে চড়িয়া।

—তোমার খামার কোন্ দিকে?

—উত্তর দিকে।

—সর্বনাশ!

সেনাধ্যক্ষের ভয়ের কারণ আর কেহ বুঝিতে না পারুক, পূর্ত-সচিব কতকটা বুঝিল।

সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণকে বলিল—নগরপ্রধানগণের এখনি একবার সম্মিলিত হওয়া আবশ্যক। আপনাদের আপত্তি না থাকে তো, আমার ভবনে আসিলে সুখী হইব।

সকলে বলিল—আপত্তি কি!

সেনাধ্যক্ষ পূর্ত-সচিবের উদ্দেশ্যে বলিল—সেই ছবিটার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারিবে।

তখন রাজপুরুষগণ সেনাধ্যক্ষের ভবনের দিকে চলিল, যাইবার আগে সেনাধ্যক্ষ জানোয়ারটাকে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য আদেশ দিয়া গেল।

পাঠক, এই নগরীর নাম মোহেন-জো-দড়ো। আজকার ধ্বংসাবশেষ নয়, পাঁচ হাজার বছর আগেকার ধনে জনে সমৃদ্ধিতে পূর্ণ জীবনচঞ্চল নগর, তৎকালীন নাম 'নন্দুর'। আর ঐ অদৃষ্টপূর্ব জন্তুটি একটি ঘোড়া।

২

সেনাধ্যক্ষের আবাসে রাজপুরুষগণের সভা বসিয়াছে। সেনাধ্যক্ষ বিপদের আশঙ্কা সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। বাঁধের উপর পূর্ত-সচিবকে যে সব কথা সে বলিয়াছিল, তাহাই আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছে, গুপ্তচর কাষ্ঠফলকে জন্তুর যে চিত্র আঁকিয়া আনিয়াছিল, তাহা সকলকে দেখাইয়াছে, সেই চিত্রের সঙ্গে জানোয়ারটির সাদৃশ্য দেখাইয়া দিয়াছে—আর বলিয়াছে, নূতন যে দুর্ধর্ষ জাতি সুদূর উত্তরে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে—এইরূপ দ্রুতগতি বাহনের জন্যই তাহারা অজেয়। তাহাদের হাতে দুই শত ক্রোশ দূরবর্তী সমৃদ্ধ নগরের যে ভাবে পতন হইয়াছে, তাহারও বর্ণনা করিতে ভোলে নাই। এবং সর্বশেষে সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া প্রস্তাব করিয়াছে যে, নগর রক্ষা করিতে হইলে অন্য খাতে ব্যয় বন্ধ করিয়া উত্তর দিকে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর তুলিতে হইবে।

পূর্ত-সচিব সেনাধ্যক্ষের যুক্তি ও প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইয়া বলিয়াছে যে, নগরের দুটি শত্রু। একটি নদী, এতদিন তাহাকেই মাত্র শত্রু বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সম্প্রতি আরও একটি শত্রুর আভাস শুনিতে পাওয়া গেল। পূর্ত-সচিব প্রস্তাব করিয়াছে যে, নগর রক্ষার জন্য উত্তর দিকে প্রাচীর গাঁথা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি অত্যাবশ্যক বাঁধের সংস্কার। সে জানাইয়া দিয়াছে যে, বাঁধটি অনেক কাল সংস্কৃত হয় নাই—উত্তর দিক্‌টায় এমনি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, এই বর্ষাতেই কি হয় বলা যায় না। আর কোন মতে এবার বর্ষাকালে টিকিয়া গেলেও আগামী বর্ষায় ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী, তখন নগরের কি অবস্থা হইবে, সকলকে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছে।

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব অনেকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করিয়া থামিল, কিন্তু

তাহাদের কথায় আর কেহ যে বিচলিত হইল, এমন বোধ হয় না। তাহার একটি কারণ, সমবেত রাজপুরুষগণের মধ্যে এই দুই জনেই বয়সে বৃদ্ধ, অবশ্য পদগৌরবেও শ্রেষ্ঠ। অন্য সকলের বয়স তারুণ্যের কোঠায়, দু'একজনকে প্রৌঢ়ও বলা যাইতে পারে।

পথাধ্যক্ষ বয়সে তরুণ। সে এবারে উঠিল এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—মাননীয় রাজপুরুষদ্বয়ের কথা শুনিলাম, কিন্তু আমি তো উদ্বেগের কারণ দেখি না, যেহেতু কোথায় কোন্ সম্ভাবিত শত্রু রহিয়াছে, তাহার আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিলে জীবনযাত্রা দুষ্কর হইয়া পড়ে। একটি অদ্ভুত জানোয়ার নগরে আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা স্বেচ্ছায় আসে নাই, আনীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঐ নিরীহ জানোয়ারটি কিরূপে যে এমন ভয়াবহ, তাহা বুঝি না। বাঘের মতো তাহার নখ নাই, গণ্ডারের মতো তাহার খড়্গ নাই, হস্তীর মতো তাহার দন্ত নাই, কোথায় তাহার ভীষণতা!

তাহার বর্ণনা শুনিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠিল।

পথাধ্যক্ষ পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার বিবেচনায় সেনাধ্যক্ষের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। আর আপনারা যদি অনুমতি করেন তো বলি যে, নিজের মর্যাদা ও নিজ বিভাগের ব্যয়বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন।

এই বলিয়া পথাধ্যক্ষ বসিল, কেহ তাহার উক্তির প্রতিবাদ তো করিলই না, বরঞ্চ ভাবগতিকে বুঝিতে পারা গেল যে, তাহাতে তাহাদের অনেকেরই সমর্থন আছে।

এবারে শকটাধ্যক্ষ উঠিল, বয়সে সেও তরুণ। সে বলিল—সেনাধ্যক্ষের উক্তির অর্বাচীনতা সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়াছে, আর প্রয়োজন নাই। আমি পূর্ত-সচিবের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাই।

এই বলিয়া আরম্ভ করিল—পূর্ত-সচিব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, সর্বত্র তিনি ভয়ের ছায়া দেখিতে পান। এ বাঁধ কত কাল নির্মিত হইয়াছে, কেহই জানে না, পূর্ত-সচিবের বয়স যতই হোক, আমার বোধ হয় তিনিও জানেন না। এতদ্দিনের

মধ্যে বাঁধ ভাঙ্গে নাই, কাজেই এবারে ভাঙ্গিবে, এমন আশঙ্কা অমূলক! আর যদিই ভাঙ্গে, পূর্ত-সচিব আছেন কেন? এমন অবস্থায় বাঁধের পিছনে অর্থব্যয় আর নদীর জলে তঙ্কা ফেলিয়া দেওয়া সমান। আমার বিবেচনায় এই উদ্দেশ্যে কপর্দক ব্যয় করাও সমীচীন নয়।

শকটাধ্যক্ষ বসিলে তরুণবয়স্ক অরণ্যাধিপতি উঠিল। সে বলিল—পূর্বোক্ত বিষয়দ্বয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট মনে করি। পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষের দাবী যে কত দূর ভিত্তিহীন, তাহা আপনারা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমার প্রসঙ্গ ভিন্ন। নগরের বৃহৎ স্নানাগারটি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—এখন সব সময়ে তপ্ত জল পাওয়া যায় না, মেঝে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, অনেক সময়েই স্নানার্থীরা পিছলে পড়িয়া যায়, এমন অবস্থায় একটি বৃহত্তর স্নানাগার-নির্মাণ আশু প্রয়োজন। নগরকোষের উদ্বৃত্ত অর্থ প্রাচীর গাঁথিয়া অপব্যয় না করিয়া নাগরিকগণের সুখ-সুবিধা যাহাতে বাড়ে, সেই উদ্দেশ্যে একটি মনোরম স্নানাগার-নির্মাণ প্রয়োজন। অনেক বিলম্ব হইয়াছে—আর কালব্যাজ অমার্জনীয়।

এবারে পুনরায় সেনাধ্যক্ষ উঠিলেন, তিনি বলিলেন—বিপদের আশঙ্কাকে আপনারা দূরবর্তী বলিয়াছেন, আমি তো দেখি, বিপদ্ একেবারে ঘরের মধ্যেই। বাহিরের আক্রমণ ভয়াবহ সত্য, কিন্তু তাহাতে জয়-পরাজয় দুই-ই সম্ভবপর। কিন্তু যে আক্রমণ আভ্যন্তরীণ, তাহার হাত হইতে বাঁচিবার উপায় কি? আসল বিপদ্ আততায়ীর ভয় নয়, আসল ভীতি সেই ভয়কে অবহেলা। পুরাতন স্নানাগারে কেহ কেহ পা পিছলিয়া পড়িয়া গিয়াছে, ইহাতেই আপনারা বিচলিত, কিন্তু আপনাদের যে মনোভাব দেখিতেছি,তাহাতে সমস্ত নগরটাই অচিরে পা পিছলিয়া পড়িয়া যাইবে আশঙ্কা হইতেছে। আপনারা এখনো সতর্ক হোন।

সেনাধ্যক্ষ বসিলে পথাধ্যক্ষ বলিল—বিপদ্‌কালে বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করিবার পরামর্শ আছে—আগে বিপদ্ আসুক, তার পরে বৃদ্ধেরা যেন মুখ খোলেন। এখনই বাক্যে কি প্রয়োজন! বৃদ্ধের মুখে বাচালতা নিতান্তই অশোভন।

—কিন্তু অর্বাচীন যখন পরামর্শদাতার পদ গ্রহণ করে, তখন বুঝিতে হইবে

যে, দুঃসময় ঘরের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সেনাধ্যক্ষই এই বাচালতার উত্তর দিতে পারিতেন, কিন্তু এ তাঁহার নিজ ভবন। আর সকলে তাঁহার অতিথি, কাজেই যে কথা এক্ষেত্রে তাঁহার বলা উচিত নয়—আমাকেই তাহা প্রকাশ করিতে হইল।

এই বলিয়া পূর্ত-সচিব বসিল।

এবারে অরণ্যাধিপতি উঠিল, বলিল—এই সব দূরস্থিত বিপদের কচ্ কচানি আর ভালো লাগিতেছে না। সন্ধ্যা সমাগত। আজ রাত্রে বৃক্ষপূজার তিথি। সাতটি নর-বলি হইবে। বলি প্রস্তুত। সেখানে যাইবার সময় হইয়াছে। চলুন, সেখানে যাওয়া যাক। কিন্তু তার আগে একটা কাজ সারিয়া লওয়া ভালো। এখানে রাজপুরুষগণ সমবেত হইয়াছেন, কাজেই নূতন স্নানাগার-নির্মাণের অর্থব্যয়ের অনুমতি আপনারা দিন।

এ বিষয়ে অধিক বিতর্ক হইল না, কেবল সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব মাত্র আপত্তি করিল, কাজেই অধিকাংশের সম্মতি অনুসারে নূতন স্নানাগার-নির্মাণের ব্যয় মঞ্জুর হইয়া গেল।

তখন আর সকলে প্রস্থান করিল, শুধু সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব মূঢ়ের মতো গালে হাত দিয়া সেই শূন্য সভাকক্ষে বসিয়া রহিল। বহির্গত রাজপুরুষদের পরিহাসের অট্টহাস্যও তাহাদের মৌনভঙ্গ করিতে পারিল না।

৩

এই ঘটনার পরে পুরা তিনটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং সেই সুদীর্ঘ সময়-মধ্যে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার লক্ষণমাত্রও দেখা যায় নাই; কাজেই এখন বৃদ্ধদ্বয় সমস্ত নগরবাসীর উপহাসের পাত্র। না উত্তর দিক্ হইতে অজ্ঞাত শত্রু আক্রমণ করিয়াছে, না পূর্ব দিক্ হইতে পরিজ্ঞাত নদী, বাঁধ ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছে।

যুগান্তকারী বিপদ্ আসিতে এক যুগ সময় নেয়—তাই বলিয়া বিপদ্ কখনোই

আসিবে না—এমন কথা মূর্খ ছাড়া কেহ বলে না। মানুষের জীবনে যুগ দীর্ঘ, সভ্যতার জীবনে তাহা পলকপাত মাত্র।

সেই ঘোড়াটি এখনো নগরে আছে, লোকে বিদ্রূপ করিয়া তাহাকে ডাকে সেনাধ্যক্ষ, আর ঘোড়াটির নখদন্তহীনতা স্মরণ করিয়া 'নখদন্তহীন বুড়ো' বলিয়া সেনাধ্যক্ষের উল্লেখ করে। পূর্ত-সচিবও বাদ যায় নাই। পূর্ত-সচিবের নাম পড়িয়াছে 'ভাঙ্গা বাঁধ,' আর বাঁধটাকে সকলে পূর্ত-সচিবের কবরখানা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।

এই ভাবে সুখে দুঃখে তিনটি বৎসর কাটিয়া গেল। চতুর্থ বৎসরে বর্ষাকালে বন্যায় জোর ধরিল, বাঁধের উত্তর দিক্‌টা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। বাঁধ রক্ষার জন্য পূর্ত-সচিবের অধীনে কতকগুলি 'রাজ' থাকিত, কিন্তু এ সঙ্কট রক্ষা করা তাহাদের সাধ্য নয়।

নিরুপায় পূর্ত-সচিব রাজপুরুষগণের নিকট লোক পাঠাইল। তাহারা এখন দিবাভাগের অধিকাংশ সময় নবনির্মিত মনোরম স্নানাগারে কাটাইয়া থাকে।

"মোহেন-জো-দড়োর অন্যতম আশ্চর্য জিনিষ, একটি স্নানাগার। স্নানাগারটি এত সুবৃহৎ ও সুগঠিত যে, এই যুগের পক্ষে ইহার চেয়ে ভালো আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ১৮০ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ১০৮ ফুট প্রস্থ। ইহা চতুর্দিকে ৭।৮ ফুট পুরু প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্নানাগারের মধ্য-ভাগে একটা প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট এবং গভীরতায় ৮ ফুট একটি সন্তরণ-বাপী আছে।.........এই সন্তরণ-বাপীটির নির্মাণকৌশল খুব চমৎকার। বিংশ শতাব্দীর সুদক্ষ পূর্ত-বিশেষজ্ঞ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িবেন। এই বাপীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে সিঁড়ি এবং সিঁড়ির নীচে স্নানার্থীদের জলে নামিবার জন্য অনুচ্চ মঞ্চ ছিল। অদূরবর্তী কূপ হইতে জল আনিবার ব্যবস্থা করিয়া বাপীটি জলপূর্ণ করা হইত এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত জলনিকাশের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সাড়ে ছয় ফুট গভীর প্রণালী ছিল। এই জলাশয়ের চতুর্দিকে তিন চার ফুট পুরু করিয়া সুন্দর ও মসৃণ ইটের গাঁথনি দেওয়া হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গেই স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করার জন্য এক ইঞ্চি

পুরু শিলাজতুর প্রলেপ দিয়া যাহাতে ইট গড়াইয়া না পড়িতে পারে, তজ্জন্য এক সারি মসৃণ পাতলা ইট দিয়া চাপিয়া দেওয়া হইয়াছিল।......বৃহৎ স্নানাগারের নিকটে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আর একটি গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে পাঁচ ফুট উচ্চ কয়েকটি চতুষ্কোণ ইষ্টকমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়; ঐগুলিতে চুল্লী বসানোর জন্য খাঁজ কাটা রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, এই গৃহে চুল্লীর সাহায্যে স্নানাদির জন্য উত্তাপ-সঞ্চয়ের এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।"*

পূর্ত-সচিবের দূত আসিয়া দেখিল যে, রাজপুরুষগণ বাপীসলিলে জলক্রীড়া করিতেছে। সে সমস্ত নিবেদন করিল। একজন রাজপুরুষ বলিল—বড় সুসংবাদ। বাঁধ ভাঙ্গাই এখন দরকার, বাপীতে আজ জল কম।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আর একজন বলিল—তুমি তোমার প্রভুকে গিয়া বলো, তিনি যেন আর একটু কষ্ট করিয়া বাঁধটা ভাঙ্গিয়া দেন। নদী আমাদের মিত্র।

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

তৃতীয় আর একজন বলিল—পূর্ত-সচিব বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল ঢুকিবে—দুশ্চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু জলের সঙ্গে যে প্রচুর মাছ ঢুকিবে—সে সুসংবাদ কি রাখেন?

হাসিতে হাসিতে বারংবার সুবৃহৎ স্নানাগার চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

অপ্রস্তুত দূত প্রস্থান করিল।

রাজপুরুষরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, নাঃ, বুড়ো দু'টোকে আর সহ্য করা যায় না।

কেহ বলিল—এ দু'টো আমাদের সকল সুখের কাঁটা!

কেহ বলিল—মরেও না, মুখও বোজে না।

—কেবল শত্রু আর বন্যা!

—কেবল এলো এলো, গেলো গেলো!

—ভয় দেখিয়ে আমাদের ভালো করিতে চান!

—আমরা খারাপটাই বা এমন কি?

* 'প্রাগৈতিহাসিক মহেন-জো-দড়ো'—শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, পৃ. ২৪—২৭।

—ওঁদের কালে ওঁরা যে কেমন ছিলেন, তা' শুনেছি তো ঠাকুমার কাছে!

—রসনা ছাড়া যাদের আর সব ইন্দ্রিয় শিথিল, তাদের আর গতি কি বলো!

—সেদিন 'নখদন্তহীন ঘোড়া' বলছিল যে, আমাদের বিলাসিতা আজকাল বড়ই বেড়ে উঠেছে, তাতেই নাকি আমাদের অধঃপতন হয়েছে।

—হয়েছে! একেবারে হওয়া শেষ! কি সর্বনাশ!

—এবারে বুড়ো দু'টোকে সরানো দরকার।

—না হে, দু'টো একটা বুড়ো থাকা ভালো, তাতে যৌবনের মূল্য বোঝবার সুবিধা হয়।

—তবে ফ্যাচ-ফ্যাচ করতে নিষেধ করে দিয়ো।

—তা না হলে আর বুড়ো কেন?

যাই হোক, পূর্ত-সচিবের প্রাক্তনের পুণ্যেই হোক আর বন্যার তীব্রতার অভাবেই হোক, বাঁধটা সে বার রক্ষা পাইয়া গেল। তাহাতে অন্যান্য রাজপুরুষ-গণের যুক্তিই প্রমাণিত হইল, বাঁধ ভাঙ্গিবার নয়। আর যা ভাঙ্গিবে না, তাহা রক্ষা করিবারই বা উদ্যম কেন! ঐ সূত্রে আরও একটা প্রসঙ্গ অনেকের মনে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল। যে বস্তু ভাঙ্গা-গড়ার অতীত, তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত আবার বৃত্তিদানের ব্যবস্থা কেন? ভাবে-গতিকে মনে হইতে লাগিল যে, বাঁধটি যাইবার আগেই হয় তো বা পূর্ত-সচিবের বৃত্তিটি যাইবে। হয় তো বা সত্যই যাইত, এমন সময়ে সেই বছরেই শীতকালে উত্তরের প্রত্যাশিত আশঙ্কা অপ্রত্যাশিতরূপে দেখা দিল।

শীতকালের প্রারম্ভে গুপ্তচর আসিয়া সেনাধ্যক্ষকে জানাইল যে, উত্তর দিকে অশ্বারোহী আততায়িগণ দেখা দিয়াছে। সে বলিল—ষোল ক্রোশ উত্তরে যে নগর আছে, অশ্বারোহিগণ তাহা লুটপাট করিতেছে এবং অগ্নিসংযোগে পোড়াইয়া দিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল, তাহারা সংখ্যায় কত?

পাঁচ শতের অধিক হইবে মনে হয় না, কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

—তাহারা কি এ নগরে আসিবে ?

—আমার মনে হয়, এই নগরের উদ্দেশ্যেই আসিতেছিল, ঐ নগরটি পথে পড়ায় এবং তাহারা বাধা দান করায় আগে সেটিকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আচ্ছা, তুমি যাও, আমি যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছি।

সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। সে জানিত, তাহারা কোথায় থাকিবে। স্নানাগারের দ্বিতলে বিশ্রামকক্ষেই অবশ্য তাহাদের পাওয়া যাইবে। পথিমধ্যে পূর্ত-সচিবকে সংগ্রহ করিয়া লইয়া তাহাকে বিপদের কথা জানাইল এবং দুইজনে স্নানাগারের বিশ্রামকক্ষে দ্বিতলে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখিল, রাজপুরুষরা সেখানে অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত।

সেনাধ্যক্ষ সংক্ষেপে তাহাদের সব সংবাদ নিবেদন করিল, কিন্তু কেহ যে বিশ্বাস করিল, এমন বোধ হইল না।

একজন রাজপুরুষ বলিল—আপনি আমাদের বালক বলিয়া মনে করেন, তাই সদা-সর্বদা জুজুর ভয় দেখাইয়া থাকেন।

আর একজন বলিল—আজ চার বৎসর ধরিয়াই তো তাহারা আসিতেছে ! এতদিন যদি আসিয়া না থাকে, তবে আজই বা আসিবার নিশ্চয়তা কি ?

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আজ না আসুক, কাল আসিবে।

—তবে সে কাল দেখা যাইবে। আজ আমাদের খেলা শেষ করিতে দিতে দিন।······নাও—তোমার রাজাকে সামলাও।

সেনাধ্যক্ষ রুষ্ট হইয়া উঠিল—বলিল, আপনাদের সব খেলাই একেবারে শেষ হইবে।···

—দেখো মন্ত্রী গেলো।

একজন রাজপুরুষ বলিল—শত্রু আসে—যুদ্ধ করুন।

—শত্রু আসিলে যে যুদ্ধ করিতে হয় জানি। কিন্তু যুদ্ধ করিতে সৈন্যের প্রয়োজন। আজ চার বৎসর বৃত্তি না পাইয়া সৈন্যগণ কর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, কেহ বা নগরান্তরে গিয়াছে। আর যাহারা আছে, শুধু হাতে তাহারা লড়িতে পারে না, সংস্কার অভাবে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।

—আমরা তাহার কি করিব ?

—কি করিব ? আপনারাই কি এজন্য দায়ী নহেন ? সৈন্যদলের প্রাপ্য বৃত্তি দিয়া আপনারা স্নানাগার গড়িয়াছেন, নূতন নূতন লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠায় অজস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন—এখন আমরা কি করিব ?

—তবে এক কাজ করুন, অর্থ দ্বারা আততায়ীদের বশ করিয়া ফিরাইয়া দিন।

—আমি ব্যবসায়ী নহি, সৈনিক, আমি যুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু দালালী করিতে জানি না।

পূর্ত-সচিব বলিল—অর্থের স্বাদ তাহাদের দিবেন না, তাহা হইলে প্রতি বৎসর তাহারা অর্থের লোভে আসিয়া হাজির হইবে।

—তখন দেখা যাইবে। এবারে তো একটা ব্যবস্থা করুন।

—ও ব্যবস্থার মধ্যে আমি নাই। তার চেয়ে আসুন, সৈন্যদলের উপরে ভরসা না করিয়া আমরাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই না কেন ?

পূর্ত-সচিব বলিল—এ যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

—হ্যাঁ, দুইজনে মিলিয়াছে ভালো ! যান, আপনারা দুইজনে লড়াই করুন গিয়া, আমরা উহার মধ্যে নাই।

—তা থাকিবেন কেন ?

সেনাধ্যক্ষ বলিতেছেন—আপনারা স্নানাগারে আছেন, অক্ষক্রীড়ায় আছেন, লিঙ্গপূজায় আছেন—আপনারা যুদ্ধের মধ্যে থাকিবেন কেন ? বৃত্তি না পাইয়া সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—কত বার আপনাদের জানাইয়াছি ! 'এই হইবে,' 'আগামী বৎসর হইবে' ! পাছে আমার গুপ্তচরেরা অশুভ সংবাদ আনিয়া আপনাদের বিলাসব্যসনে বাধা জন্মায়, তাই তাহাদের ধরিয়া ধরিয়া বৃক্ষদেবের নিকটে বলি দিয়াছেন ! এখন যখন বিপদ্ আসন্ন, আপনারা সব দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিতেছেন—আমরা উহার মধ্যে নাই।

একজন রাজপুরুষ রাগিয়া উঠিয়া বলিল—মহাশয়, অধিক ফ্যাচফ্যাচ করিবেন না, যান—ভাগুন।

এই বলিয়া একটি অক্ষগোলক সেনাধ্যক্ষকে ছুঁড়িয়া মারিল। কাষ্ঠগোলক তাহার কপালে লাগিয়া রক্ত বাহির হইল।

পূর্ত-সচিব বলিল—আপনারা বীর বটে, বন্ধুকে আঘাত করিতে হাত কুণ্ঠিত হয় না।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—এ মন্দের ভালো! হাত একবার উঠিয়াছে। এই হাত শত্রুর বিরুদ্ধে উঠুক!

—শত্রু আপনার মাথায়।

—তাই বুঝি সেখানে আঘাত করিলেন! আপনারা কেবল বীর নন, বুদ্ধিমান্‌ও বটে!—বলিলেন পূর্ত-সচিব।

—শত্রু আসুক, তখন দেখা যাইবে।

—শত্রু অবশ্যই আসিবে, তখন আর আপনাদের দেখা পাওয়া যাইবে না।

এই বলিয়া সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব স্থানত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। রাজপুরুষগণ পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিল।

—নাও, তোমার রাজা গেলো!

—মন্ত্রীর দোষেই।

তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে নগরবাসীরা এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে পাইল। তাহারা দেখিল, উত্তর দিগন্তে অকালে ধূলার ঝড় উঠিয়াছে। যাহারা জাগিয়া ছিল, ভালো করিয়া দেখিবার আশায় ছাদের উপরে উঠিল; যাহারা তখনো নিদ্রিত ছিল, নগরের কোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া 'কি হইয়াছে' শুধাইতে শুধাইতে বাহিরে আসিল!

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিবের কাছে এ দৃশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। তাহারা অপমানের আশঙ্কা সত্ত্বেও রাজপুরুষগণের ভবনের দিকে রওনা হইল!

পথাধ্যক্ষ জাগরিত হইয়া বলিল,—সত্যই আসিয়াছে, না সমস্তটাই আপনাদের কল্পনা!

অরণ্যাধিপতি বলিল—দূরে আছে, এদিকে না আসিতেও পারে।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আসিয়া পড়িলে আপনারা ব্যবস্থা করিবেন। সৈন্য নাই,

অস্ত্র নাই, যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই, নামে মাত্র সেনাধ্যক্ষ হইয়া আমি কি করিব ?

—সে জন্য আপনাকে দুশ্চিন্তা করিতে হইবে না, যান।

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব সমস্ত দৃশ্যটা পর্য্যবেক্ষণ করিবার আশায় বাঁধের উপরে গিয়া উঠিল।

বাঁধের উপর হইতে তাহারা দেখিল যে, ধূলার দিগন্ত ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, কাছে, আরো কাছে। ক্রমে ধূলিপটল ভেদ করিয়া অশ্ব ও অশ্বারোহী দৃষ্ট হইল। গুপ্তচরের অনুমান ভুল নহে, সংখ্যায় পাঁচ শতের কাছাকাছি। তাহারা দেখিল যে, পাঁচ শত অশ্বারোহী নগর-সীমান্তে উপস্থিত। তেজস্বী জন্তুর উপরে সমান তেজস্বী সব পুরুষ। তাহাদের অঙ্গে পশুচর্মের আচ্ছাদন, পৃষ্ঠে তূণ, স্কন্ধলগ্ন ধনুক, দক্ষিণ হাতে দীর্ঘ বর্শা, বাম হাতে বল্‌গা; আর সকলকে ম্লান করিয়া দিতে পারে, দেহের এমন জ্যোতির্ম্ময় কান্তি। তাহারা দেখিল, আততায়ীদের বর্ণ গৌর, প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ণ নাসিকা, দীর্ঘপ্রলম্বিত কেশ, মুখমণ্ডল গুম্ফশ্মশ্রুহীন! শত্রু হইলেও তাহাদের মনে বিস্ময়ের ভাব উদিত হইল—হাঁ, ইহারাই দেশের অধিপতি হইবার যোগ্য বটে!

কিন্তু অলীক চিন্তার সময় তাহাদের ছিল না। তাহারা দেখিল যে, কয়েক-জন রাজপুরুষ অশ্বারোহীদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। অশ্বারোহীদের কয়েকজন অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া উভয় পক্ষে কি সব কথাবার্তা হইতে থাকিল। অবশেষে তাহারা দেখিতে পাইল যে, শকট বোঝাই করিয়া থলিপূর্ণ যব গম ও নানা প্রকার খাদ্য অশ্বারোহীদের নিকটে নীত হইতেছে। দেখিতে পাইল যে. মূল্যবান্ রঙিন চর্ম-থলিকায় বোঝাই সুবর্ণ-মুদ্রা তাহাদের নিকটে নীত হইতেছে; তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, আত্মরক্ষার সহজতম পন্থাটাই গৃহীত হইল। তাহারা জানিত, সহজতম পন্থায় আত্মরক্ষা করিতে উদ্যত হইলে শেষ পর্য্যন্ত আত্মবিনাশ ঘটিয়া থাকে। তারপরে তাহারা দেখিল যে, থলিগুলি অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া আততায়িগণ ঘোড়ার মুখ উত্তরদিকে ফিরাইয়া দিল। তখন শীতের সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

বাঁধ হইতে নামিবার মুখেই রাজপুরুষগণের সঙ্গে সেনাধ্যক্ষ ও তাহার সঙ্গীর সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের দেখিতে পাইয়া পথাধ্যক্ষ বলিল—এবারে বিশ্বাস হ'লো তো যে, আমরা শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ!

পূর্ত-সচিব—ইহার নাম আত্মবিক্রয়, আত্মরক্ষা নয়।

পথাধ্যক্ষ। আপনারা তো লড়াই করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের পরিণাম সব সময়েই অনিশ্চিত, নিশ্চয়ের মধ্যে—লোকক্ষয়।

সেনাধ্যক্ষ। আরও একটা বিষয়ে নিশ্চিত। পরাজিত হইলে তাহারা আর এদিকে আসিত না।

পথাধ্যক্ষ। আর আসিবে না বলিয়া গিয়াছে।

সেনাধ্যক্ষ। আর পাঁচ শত মাত্র আসিবে না, এবারে পঞ্চাশ সহস্র আসিবে।

পথাধ্যক্ষ। আবার ভীতি প্রদর্শন?

অরণ্যাধিপতি। কেন পঞ্চাশ সহস্র আসিবে, কারণ শুনিতে পারি?

সেনাধ্যক্ষ। প্রথম কারণ, তাহারা ভাবিয়াছিল, অন্যান্য লুণ্ঠিত নগরের মতো ইহাও একটি ক্ষুদ্র পত্তন, তাই সামান্য সংখ্যায় আসিয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, তাহারা দেখিল যে, সিন্ধুপত্তনের ইহা সব চেয়ে সমৃদ্ধ ও বৃহত্তম নগর। তৃতীয় কারণ, বুঝিয়া গেল যে, এই নগরে কেবল স্ত্রীলোক, বালক ও কাপুরুষের বাস; বুঝিয়া গেল যে, ইহারা শুধু কাপুরুষ নয়, নির্বোধও, নতুবা ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নিনির্বাপণের চেষ্টা করিত না। কাজেই আপনারা নিশ্চিত থাকুন, শীঘ্রই তাহারা এমন অমিত সংখ্যায় আসিবে, যাহাদের পরাস্ত করিবার বা উৎকোচ দ্বারা লোভ প্রশমিত করিবার ক্ষমতা আপনাদের নাই। চতুর্থ কারণ, ইহারা বীর পুরুষ।

পথাধ্যক্ষ। উহাদের বলিতেছেন বীর! ঐ তো চেহারা! পাথর-চাপা-পড়া ঘাসের মতো, বিবর্ণ রঙ্! বসন বুনিবার বুদ্ধি নাই বলিয়া যাহারা পশুচর্ম পরিধান করে! যেমন বীর, তেমনি বিদ্বান্, তেমনি বুদ্ধিমান্!

সেনাধ্যক্ষ। তৎসত্ত্বেও ইহাদের সম্মুখে এই সুবৃহৎ দেশের গৌরবময়

ভবিষ্যৎ বিস্তারিত। এখনো সতর্কবাণী অবধান করুন, অবিলম্বে প্রস্তুত হোন, নতুবা অচিরকাল মধ্যে আপনাদের সমৃদ্ধি ও জীবন ঐ অস্তমান সূর্যের মতো বিলয়ের দিগন্ত স্পর্শ করিবে।

সেনাধ্যক্ষের কথায় সকলের হুঁস হইল! তাই তো, সন্ধ্যা সমাগত!

পথাধ্যক্ষ বলিয়া উঠিল—বৃথা বিতর্কে লাভ নাই, আজ লিঙ্গপ্রতিষ্ঠায় ভোজের নিমন্ত্রণটা বিস্মৃত হইবেন না। সন্ধ্যার পরেই সময়, স্থান—এই দীনের ভবন।

অত্যাবশ্যক কার্যসূচী মনে পড়িয়া যাওয়ায় সকলে দ্রুত প্রস্থান করিল। সেনাধ্যক্ষ ও পূর্তসচিবকে কেহ আহ্বান করিল না। তাহারা সেই নির্জন অন্ধকারের মধ্যে মূঢ়ের মতো নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতেও সাহস হইল না।

৪

সেনাধ্যক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে বড় বিলম্ব হইল না। পর বৎসর বর্ষাকালেই খবর আসিয়া পৌঁছিল যে, অশ্বারোহী আততায়ী আসিতেছে, এবারে আর পাঁচ শত মাত্র নয়, অগণ্য। শীতকালেই যুদ্ধের প্রশস্ত সময়, কিন্তু শত্রু বুঝিয়াছে, দুর্বল ও কাপুরুষকে আক্রমণে কালাকাল বিচারের প্রয়োজন নাই।

এই কয়েক মাসের মধ্যে নগরের নৈতিক মেরুদণ্ড আরও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। রাজপুরুষগণ দেখিয়াছে যে, সৈন্যের চেয়ে স্বর্ণ অধিক শক্তিক্ষম। তাহারা সৈন্যদল একেবারেই ভাঙিয়া দিয়াছে, কেবল সেনাধ্যক্ষের মুষ্টিমেয় অনুচরকে দূর করিতে পারে নাই। সৈন্যে আর প্রয়োজন কি? শত্রুরা কি বলিয়া যায় নাই যে, তাহারা আর আসিবে না? আর যদিই বা আসে, যুদ্ধে বৃথা রক্তক্ষয় না করিয়া উৎকোচ দান করিলেই কার্য সিদ্ধ হইবে।

আবার রাজপুরুষগণের জীবনযাত্রা অনুসরণ করিয়া নগরের সাধারণ লোকেরাও বিলাসের সুলভ সংস্করণ প্রচারণায় লাগিয়া গিয়াছে। আগে যে

অর্থ ও সামর্থ্য তাহারা চাষবাসে নিয়োগ করিত, তাহা দিয়া স্থানে স্থানে স্নানাগার তৈয়ারী করিয়াছে, রাজপুরুষগণের স্নানাগারের মতো তেমন মনোরম নয়, তবে মন্দও নয়; স্থানে স্থানে লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহার পূজায় সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকে; আর আগে যাহাদের গমের ও যবের রুটি হইলে চলিত, এখন অন্ততঃ তাহার সঙ্গে মাছ মাংসের ৫।৭টি পদ আহার করিয়া থাকে; রাজপুরুষগণের আহার্য্য কমপক্ষে দশপদী; রাজপুরুষগণ আগে তামার পাত্র ব্যবহার করিত, এখন রৌপ্যপাত্র ব্যবহার করে, লোকসাধারণ আগে মৃণ্ময় পাত্র ব্যবহার করিত, এখন তাম্রপাত্র ছাড়া ব্যবহার করে না! ফলকথা, সমস্ত নগর বিলাসের স্রোতে গা ছাড়িয়া দিয়াছে। নদীর স্রোত সমুদ্রগামী, জাতীয় বিলাসের স্রোত সর্বনাশের সমুদ্র পর্য্যন্ত না লইয়া গিয়া থামে না। বিশেষ সকলেই দেখিয়াছে যে, আর যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া মরিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে আর নিয়মচর্যায় ও সামরিক শৃঙ্খলায় আবশ্যক কি? শত্রুকে বশ করিবার মত নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন সমাজ আত্মার চেয়ে অর্থের উপরে যখন বেশী ভরসা করে, বুঝিতে হইবে, তখন সর্বনাশের আর বিলম্ব নাই।

এই সর্বনাশের প্লাবনের মধ্যে যুগল গিরিশৃঙ্গের মতো সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব অটল, অচল। সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণের ভরসা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে, আশঙ্কার কারণ সে আর বুঝাইতেও চেষ্টা করে না; প্রয়োজন কি! ঐ তো এক কথা শুনিতে হইবে,—মহাশয়, আমাদের সৈন্য নাই থাকিল, স্বর্ণ আছে। এখন সে মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে, জয় করিবার আশায় নয়, বাধা দিবার জন্য এবং মরিবার জন্য। সময়বিশেষে জয়ের চেয়ে পরাজয় অধিকতর গৌরবদ্যোতক। সেনাধ্যক্ষ জানিত, স্বর্ণস্বাদলুব্ধ শত্রু আবার আসিবে এবং তাহা অগৌণে। কিন্তু পরবর্তী শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যে বর্ষাকালেই আসিয়া দেখা দিবে, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই।

পূর্ত-সচিবের অবস্থাও সমান অসহায়। সে সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে, এবারে বন্যার পঞ্চবার্ষিক জোর বাঁধিবার সময়, বাঁধ মেরামত না করিলে নগর রক্ষা পাইবে না। কিন্তু কে কার কথা শোনে? শঙ্কার

সতর্কবাণী বিলাসের কানে কবে প্রবেশ করিয়া থাকে? রাজপুরুষগণের সহযোগিতা ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। অর্থ কোথায়? লোকজন কোথায়? সেনাধ্যক্ষের মতো তাহারও অবশ্য মুষ্টিমেয় অনুচর আছে, কিন্তু বাঁধের এখন যে অবস্থা, তাহা মুষ্টিমেয়ের সাধ্যের অতীত। সে অবশ্যম্ভাবীকে মানিয়া লইয়া সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়াছে যে, বর্ষাকালে উভয়ের অনুচর একত্র করিয়া বাঁধ রক্ষা করিবে এবং শীতকালে আবার উভয়ের অনুচর একত্র করিয়া আততায়িগণকে বাধা দিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু তখন তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, দুই বিপদ্‌ একত্র আসিয়া পড়িয়া তাহাদের সমস্ত পরিকল্পনা পর্যুদস্ত করিয়া দিবে। ধর্ম যখন মারে, তখন একেবারে সমূলে আঘাত করিয়া মারে।

একদিন বর্ষার প্রারম্ভে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব বাঁধের উপর ঘুরিতেছিল, পূর্ত-সচিব এখন দিনরাত্রির অনেকটা অংশই বাঁধের উপরে কাটাইয়া থাকে। মুমূর্ষু সন্তানের শিয়রে জননীর মতো, বন্যাপ্রহত নগরের ঊর্ধ্বে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ—দু'জনেই নির্নিমেষদৃষ্টি। জল প্রতিদিন বাড়িতেছে, স্রোত প্রতিদিন প্রবলতর হইতেছে; বাঁধের উত্তরদিকের কতকটা ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, এখনো নগরে জল প্রবেশ করে নাই বটে, তবে আর খানিকটা ভাঙিয়া পড়িলেই করিবে। পূর্ত-সচিবের অনুচরেরা ভগ্নস্থান গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দিনে যেটুকু গাঁথিয়া তোলে, রাত্রে জল বাড়িয়া সেটুকু ধ্বসিয়া যায়। মানুষের হাতে ও নদীর স্রোতে সে এক প্রতিযোগিতা পড়িয়া গিয়াছে।

বাঁধের নীচে কারিকরেরা দেওয়াল গাঁথিতেছে, উপরে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ কথোপকথনের অবকাশে তাহাদের কাজ দেখিতেছে।

পূর্ত-সচিব। নদী ইতোমধ্যেই কত প্রসারিত হইয়া গিয়াছে, ওপার আর দেখা যায় না।

সেনাধ্যক্ষ। বর্ষার সূচনাতেই এমন তো কখনো দেখি নাই।

পূর্ত-সচিব। কাল রাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়াছি। নদী যেন দ্বিধা হইয়া নগরকে গ্রাস করিতে উদ্যত। সে যেন সাপের দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা;

একটা আসিতেছে পুব হইতে, আর একটা উত্তর হইতে, দু'টাতে মিলিয়া নগরকে জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত।

সেনাধ্যক্ষ। পুবেরটা বুঝিতে পারি, নদী। উত্তরেরটা কি?

পূর্ত-সচিব। স্বপ্নের আবার বোঝাবুঝি!

সেনাধ্যক্ষ। বোধ করি, তাহারও প্রয়োজন আছে। উত্তর দিকের বিপদও আমাদের আসন্ন।

পূর্ত-সচিব। শত্রু? সে তো শীতকালে।

সেনাধ্যক্ষ। তাহা হইলেই মন্দের ভালো। তবে রক্ষা কিছুতেই নাই। ঐ যে নগরের অগণ্য গৃহ হইতে সূপকার্যের ধূম উঠিতেছে, উঠিতেছে ক্ষীয়মাণ কর্মকোলাহল, ঐ যে পথে লোক-জীবনের চঞ্চলতার চিহ্ন, আর, ঐ যে আরও দূরে ছক-কাটা ক্ষেত্রসমূহে গোধূমের নবাঙ্কুর, ঐ যে গৃহপালিত গো-মহিষ, ছাগ প্রভৃতি—পালনকর্তার সঙ্গে ইহারাও লোপ পাইবে!

পূর্ত-সচিব। কেমন করিয়া জানিলে?

সেনাধ্যক্ষ। তোমার সেই স্বপ্নে দৃষ্ট দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা—

পূর্ত-সচিব। পুবেরটাকে হয় তো এবারেও সংযত রাখিতে পারিব।

সেনাধ্যক্ষ। কিন্তু উত্তরেরটা? প্রকৃতির লোভ সীমাবদ্ধ, মানুষের লোভকে সংযত করিবে কার সাধ্য?

পূর্ত-সচিব। আজ তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?

সেনাধ্যক্ষ। কি জানি। ও কিসের গর্জন?

পূর্ত-সচিব। নদীর। পরিচিত গর্জন।

সেনাধ্যক্ষ। তাও বটে! কিন্তু আজ সমস্তর উপরেই কেমন একটা অপরিচয়ের সূক্ষ্ম পর্দা যেন পড়িয়া গিয়াছে!

পরদিন প্রাতঃকালে গুপ্তচর আসিয়া জানাইল যে, উত্তরদিকে অশ্বারোহী আততায়ী দেখা দিয়াছে। এই সংবাদে সেনাধ্যক্ষ বিস্মিত বা বিচলিত কিছুই হইল না, কেবল শুধাইল সংখ্যায় কত?

—অগণ্য, অসংখ্য, তরঙ্গের পরে তরঙ্গ।

ঠিক হইয়াছে। যাও, রাজপুরুষদের নিবেদন করো গিয়া। আমার আর কিছু করিবার নাই। কেবল আমার অনুচরদের বলিয়া দিয়া যাও, এখন হইতে তাহারা আমার আবাসের নিকটই যেন থাকে, ডাকিবা মাত্র যেন পাই।

গুপ্তচর প্রস্থান করিল।

তাহার কথা রাজপুরুষগণের কেহই বিশ্বাস করিল না। কেহ রাগ করিল, কেহ বিরক্ত হইল, কেহ বলিল, সেনাধ্যক্ষ একবার নিজে না আসিয়া লোক পাঠাইয়া পরীক্ষা করিতেছে, কেহ বলিল, আগে আসুক, কেহ বলিল, কোষাধ্যক্ষ যেন কিছু সুবর্ণমুদ্রা প্রস্তুত রাখে। দূত চলিয়া গেলে তাহারা পুনরায় বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন হইল।



নগরের চিহ্নিত জীবনের আরও একটা দিন গত হইয়াছে। প্রাতঃকাল। বাঁধের উপরে দণ্ডায়মান পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ। তাহারা নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছে এবং পরস্পরের মনও জানে। রাত্রের মধ্যে জল অনেকটা বাড়িয়াছে, কারিকরেরা ভাঙ্গা জায়গা বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ। পূর্ত-সচিব, শেষে তোমার সেই স্বপ্নের কথাই সত্য হইয়া উঠিল দেখিতেছি।

পূর্ত-সচিব। কোন্ কথা?

সেনাধ্যক্ষ। সেই উত্তর দিকের জিহ্বা।

এবারে পূর্ত-সচিব কালকার মতো আর প্রতিবাদ করিল না, উত্তর দিকের বিপদ্ সম্বন্ধে এখন তাহারা নিঃসংশয়, বস্তুতঃ উত্তর দিগন্ত কখন্ চঞ্চল হইয়া উঠিবে, তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যেই বাঁধের উত্তর প্রান্তে উত্তর দিকে মুখ করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া ছিল। যে কোন মুহূর্তে উত্তর সীমান্তে ধূলা উড়িয়া উঠিতে পারে।

মধ্যাহ্ন কাটিল, অপরাহ্নও কাটিয়া গেল, রাত্রি আসিয়া পড়িল। নগরের

কোলাহল কমিল, নদীর কলগর্জন বাড়িল ; গৃহে গৃহে দীপ জ্বলিল, আকাশে তারা ফুটিল ; পূবে একখানা ঘনমেঘ উঠিল, তাহার ছায়ায় নদী চামুণ্ডামূর্ত্তি ধরিল।

পূর্ত্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ বাঁধ হইতে নামিতে যাইবে, এমন সময়ে পূর্ত্ত-সচিব চমকিয়া বলিল—ও কি !

—তাই তো ও কি !

উত্তর দিগন্তে অস্পষ্ট আলোর বিন্দু।

—ওখানে তো আলো দেখা দিবার কথা নয় !

—যাহা নয়, তাহাই হইতে চলিয়াছে।

—তবে কি—

কোন সন্দেহমাত্র নাই।

প্রতি মুহূর্তে আলোর সারি দীর্ঘতর, আলোর দীপ্তি উজ্জ্বলতর হইতে এবং ক্রমে আলোর সীমানা নিকটতর হইতে লাগিল। পূর্ব হইতে পশ্চিমে যতদূর দেখা যায়, আর অসংখ্য আলোর আভায় কতদূর যে দেখা যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, সমস্ত আলোর ফুটকিতে ভরিয়া গিয়াছে। আকাশে তারা যেমন অগণ্য, সৈকতে বালু যেমন অসংখ্য, বনস্পতিতে পাতা যেমন অজস্র, তেমনি অগণ্য, অসংখ্য, অজস্র আলোকবিন্দু! আততায়ী সর্পের মাথার মণির প্রভায় সন্ত্রস্ত হরিণ যেমন মুগ্ধ বিস্ময় অনুভব করে, নগরবাসীও তেমনি একপ্রকার ভাব অনুভব করিল। মৃত্যু যদি মোহন মূর্তিতে আসে, তবে তাহার ভয়াবহতা অনেকটা হ্রাস পায়। রাত্রি দুই প্রহরের মধ্যে বসন্তকালে সমস্ত প্রান্তর যেমন ছোট ছোট ফুলে ভরিয়া যায়, তেমনি মহেন-জো-দড়োর উত্তরদিক্ আলোয় আলোয় ভরিয়া গেল। আর বসন্তের অরণ্যে বাতাস বহিলে যেমন একপ্রকার মিশ্রিত গুঞ্জন শ্রুত হয়, তেমনি একপ্রকার চাপা শব্দ উঠিতে লাগিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নগরবাসী সেই ভীষণ শোভার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া সে রাত্রিটা ছাদে ছাদে কাটাইয়া দিল ; আর স্থিরকর্তব্য সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত্ত-সচিব বাঁধ হইতে অবতরণ করিল না, তাহাদের মন আজ লঘু, তাহাদের লক্ষ্য আজ স্থির ; কেবল চরাচরব্যাপী নিস্তব্ধতার কালো ঘোড়াটাকে নদীর কলধ্বনির চাবুকের

আঘাত বারংবার চঞ্চল করিয়া তুলিতে বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, সকলেই প্রভাতের অপেক্ষায় রহিল।

প্রভাত হইলে উদ্বিগ্ন নগরবাসী দেখিতে পাইল যে, দগ্ধমশালপরিকীর্ণ সেই বিশাল প্রান্তর অশ্ব ও অশ্বারোহীতে পূর্ণ। অশ্বারোহিগণের অনেকে নিদ্রিত, অনেকে সবেমাত্র জাগিয়া উঠিতেছে; অশ্বসকল স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া, ঘাড় নীচু করিয়া, ঘাস খুটিয়া খাইতে নিযুক্ত। আবার আততায়িগণ এতক্ষণ স্পষ্টভাবে অট্টালিকারণ্যসদৃশ সেই সমৃদ্ধ নগর দেখিতে পাইল, তাহাদের উৎসাহের অবধি রহিল না।

বাঁধের উপর হইতে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব দেখিতে পাইল যে, নগরবাসীর একটি ক্ষুদ্র দল আততায়িশিবিরের দিকে চলিয়াছে, সঙ্গে কয়েকখানি দ্রব্যসম্ভার-পূর্ণ শকট। তাহারা বুঝিতে পারিল, রাজপুরুষগণ ভেট সহকারে নবোদ্ভাবিত কৌশল-প্রয়োগে নগর রক্ষা করিতে চলিয়াছে।

রাজপুরুষগণ আততায়ীদের দলপতিসমীপে উপস্থিত হইয়া খাদ্যসম্ভার ও স্বুবর্ণমুদ্রা-পূর্ণ পেটিকা অর্পণ করিল, এবং সবিনয়ে নিবেদন করিল যে, এবারে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের ফিরিয়া যাওয়া উচিত। দলপতি দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিয়া জানাইল যে, তাহারা "আরিয়" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ: তাহারা উপঢৌকন গ্রহণ করে, কিন্তু উৎকোচ লয় না।

পথাধ্যক্ষ বলিল—গতবারে তো লইয়াছিলে।

ক্রুদ্ধ দলপতি তাহার মুখে চাবুকের আঘাত করিয়া বলিল—চুপ্ কর বর্বর!

দলপতির আদেশে কয়েকজন লোক আসিয়া রাজপুরুষগণের বেশবাস কাড়িয়া লইয়া তাহাদের খুঁটির সহিত বাঁধিয়া ফেলিল। তারপরে দলপতির আদেশে সমস্ত প্রান্তর চঞ্চল হইয়া উঠিল, আততায়িগণ যে যাহার অশ্বে চড়িয়া প্রস্তুত হইল।

বাঁধের উপর হইতে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব দেখিল যে, অশ্বারোহিগণ নগরের দিকে ধাবিত হইয়াছে, সারির পরে সারি, তরঙ্গের পরে তরঙ্গ; প্রথম দলের পদাঘাতেই রাজপুরুষগণ পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, তারপরে ঝটিকা-চালিত

সমুদ্র-তরঙ্গ যেমন তটে আঘাতের পরে আঘাত করিতে থাকে, তটভূমি রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া উঠিতে থাকে, তেমনি সমস্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। নগরবাসী যুদ্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, তাই স্ত্রীপুরুষ বালক বৃদ্ধ শতে শতে পলায়ন করিতে লাগিল; একদিকে অসহায় আর্তনাদ, অপরদিকে অশ্ব ও মানুষের বিজয়োল্লাস! নগর ও নগরবাসী প্রহৃত, আহত, নিহত, দলিত, মথিত, মর্দিত হইতে লাগিল।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—ভাই, আর সহ্য হয় না, চলিলাম।

পূর্ত-সচিব বুঝিল, মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া সেনাধ্যক্ষ মরিতে চলিল।

পূর্ত-সচিব বলিল—যাও, আমিও আসিতেছি, কিন্তু নগর অধিকৃত হইতে দিব না—ইহা নিশ্চয় জানিও।

সেনাধ্যক্ষ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সব বুঝিল, তাহারা পরস্পরের মন ভালো করিয়াই জানিত।

নিঃসঙ্গ পূর্ত-সচিব দেখিল, মুষ্টিমেয় অনুচর-পরিবৃত সেনাধ্যক্ষ শত্রুসৈন্যমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল, আর প্রবল আবর্তে তৃণখণ্ড ভাঙিয়া যেমন শত খণ্ড হইয়া কোথায় বিলীন হয়, সেনাধ্যক্ষ ও তাহার সৈন্য কয়জন মুহূর্তমধ্যে তেমনি কোথায় তলাইয়া গেল!

সেনাধ্যক্ষ তাহার ঋণ শোধ করিল, রাজপুরুষগণ আগেই করিয়াছিল, এবারে পূর্ত-সচিবের পালা। সে দেখিল যে, এমন বহু সহস্র অশ্বারোহী বাঁধের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। সে বুঝিল, সুযোগ আসিয়াছে। সে একবার নদীর দিকে তাকাইল, কাল রাত্রিতে বন্যার জল ও স্রোত দুই-ই বাড়িয়াছে।

তখন সেই বৃদ্ধ বাঁধের উপর নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল, বসিয়া পড়িয়া করজোড় করিয়া ঊর্ধ্বে চাহিয়া বলিল, হে মৎস্যদেব, এ নগর তোমার, তুমি ইহাকে রক্ষা করো। হে মৎস্যদেব, এ নগর তোমার আশ্রিত, শত্রুকবলগ্রাসের গ্লানি হইতে তুমি ইহাকে রক্ষা করো। হে মৎস্যদেব, আমি দুর্বল, আমার মনে বল দাও।

তারপরে সিন্ধুনদের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল—হে নদ, এতদিন

তোমাকে বিষম শত্রু মনে করিতাম, আজ তুমি পরম মিত্র! হে নদ, এতদিন তোমার গ্রাস হইতে নগর-রক্ষায় প্রাণপণ করিয়াছি, আজ বুঝিতেছি, তোমার গ্রাসই নগর-রক্ষার একমাত্র উপায়। হে নদ, তুমি নগর গ্রাস করো, গ্রাস করিয়া শত্রুকবল হইতে রক্ষা করো। হে নদ, তুমি মৎস্যদেবের বাহন, এ নগর মৎস্যদেবের আশ্রিত, তুমি তাহাকে আপন আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রক্ষা করো।

তারপরে আর্তকণ্ঠ আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, —বল দাও, দেবতা, বল দাও।

এই বলিয়া নীচে যেখানে কারিকরগণ বাঁধ মেরামত করিতেছিল, সেখানে সে নামিয়া গেল—চীৎকার করিয়া বলিল—লাগা, লাগা, সকলে হাত লাগা।

প্রভুর উৎসাহবাক্যে সকলে দ্বিগুণ বেগে প্রাচীর গাঁথিতে সুরু করিল, কিন্তু পূর্ত-সচিব বলিল—না, না, আজ উল্টো হাত লাগা!

—সে কি, প্রভু!

—ঐ তো রে। যখনকার যা নিয়ম! ভাঙ! ভাঙ! বাঁধ ভাঙিয়া ফেল!

সকলে ভাবিল, পূর্ত-সচিব উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্যথা করিতে পারিল না, যেহেতু তাহারা প্রভুর আদেশ পালনে অভ্যস্ত, বিশেষ দেখিতে পাইল যে, স্বয়ং প্রভু বাঁধ ভাঙিবার কাজে অগ্রণী হইয়া হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

সকলে বাঁধ ভাঙিতে লাগিয়া গেল! গড়া কঠিন, ভাঙা সহজ। ভাঙন অপ্রত্যাশিত দ্রুত বাড়িয়া চলিল, বিশেষ সঙ্গে ছিল বন্যার প্রচণ্ড সহযোগিতা! দেখিতে দেখিতে দণ্ড. দুই সময়ের মধ্যে বাঁধের একটা বিরাট্ অংশ ধ্বসিয়া পড়িয়া সেখানে জল ঢুকিল; জলের পথ মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়িতে লাগিল, এবং এক সময়ে একটা সুবৃহৎ তরঙ্গের প্রচণ্ড ধাক্কায় বাঁধের সমগ্র উত্তর অংশটা খসিয়া পড়িয়া মৎস্যদেবের তরঙ্গশীর্ষ বিজয়রথ নগরমধ্যে বিজয় কল্লোলে ঢুকিয়া পড়িল।

জলের প্রথম আঘাতেই সানুচর পূর্ত-সচিব কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল! এতক্ষণ পরে পূর্ত-সচিবও তাহার ঋণশোধ করিল।

সমস্ত নদীটা যেন নগরমধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

অশ্বারোহিগণ পার্শ্বে তাকাইয়া দেখিল—এ এক অপ্রত্যাশিত সঙ্কট! নদী

তাড়া করিয়া পিছনে পিছনে আসিতেছে! জল অতলস্পর্শ। তখন পিছু হটিবার তাড়া পড়িয়া গেল। একদল অশ্বারোহী অপর দলকে মথিত করিতে লাগিল, সকল দলই ডুবিয়া মরিল। অশ্বারোহিগণ প্রান্তরবাসী, নদীকে তাহাদের বড় ভয় ছিল, অবশেষে সেই নদীই তাহাদের আক্রমণ করিল! সকলে ডুবিল! নগরবাসী ও অশ্বারোহী কেহই প্রাণে বাঁচিল না। কেবল যে-সব অশ্বারোহী জলের সীমানার বাহিরে ছিল, তখনো নগর-সমীপে আসিয়া পৌঁছায় নাই, তাহারাই বাঁচিল; তাহারা অশ্বের মুখ ফিরাইয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে দ্রুততর বেগে ছুটিয়া পালাইল।

প্রাতঃকালে যেখানে ধনজনসমৃদ্ধ মহানগর ছিল, সন্ধ্যাকালে সেখানে দেখা গেল, দুস্তর জলমরুর অমেয় বিস্তার!

পূর্ত-সচিব সত্যই তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছে, নগর শত্রুগণ কর্তৃক অধিকৃত হইতে সে দেয় নাই।

চরাচরব্যাপী সেই তরল অন্ধকারের ভূমিকার উপরে নিত্যকার মতো আজও নিঃশব্দে সন্ধ্যাতারাগুলি উঠিল।*

---

* এই গল্প রচনায় ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ তথ্যের কাছাকাছি থাকিতে চেষ্টা করিয়াছি। মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসের দুটি কারণ অনুমান করা হয়, সিন্ধুর বন্যা ও আর্য জাতির আক্রমণ। ইতিহাসের সহিত যেটুকু কল্পনা মিশাইলে গল্প হয়, তাহার বেশী কল্পনা না মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

মহালগ্ন

মাসিডনপতি দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর শা এশিয়া মাইনর অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতেছেন।

তাঁহার অজেয় অশ্বারোহী বাহিনীর আঘাতে ছোট-বড় কত রাজ্য ভাঙিয়া পড়িল; পারস্য গেল, মিশর গেল, বাহ্লীক গেল, কোন রাজ্যই তাঁহার গতি-রোধ করিতে সমর্থ হইল না। অবশেষে তিনি হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া কাবুলে পৌঁছিলেন।

সেখানকার পার্বত্য অধিবাসীরা তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়া এমন শিক্ষা পাইল যে, তাহা ভুলিতে তাহাদের দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। অবশেষে তিনি একদা বসন্তকালে সিন্ধু-নদ পার হইয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার আগে পাশ্চাত্য খণ্ডের আর কোন দিগ্বিজয়ী ভারতবর্ষে প্রবেশ করে নাই, আর কাহারো মুগ্ধদৃষ্টি ভারতবর্ষের উদার সৌন্দর্য দর্শন করে নাই।

সিন্ধু নদ পার হইয়া সেকেন্দর শা তক্ষশিলা নগরীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। সিন্ধু ও বিতস্তা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড আম্ভীরাজের অধিকারভুক্ত, তাহার রাজধানী তক্ষশিলা। আম্ভীরাজ তখন প্রতিবেশী রাজন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। তিনি দিগ্বিজয়ী বীরকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, তিন হাজার সুপুষ্ট পুংগব ও দশ হাজার মেষ উপঢৌকনস্বরূপ তাঁহার শিবিরে পৌঁছাইয়া দিলেন। সেকেন্দর তক্ষশিলা-রাজের ব্যবহারে প্রীত হইয়া সেনাগণকে বিশ্রামের আদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। বিতস্তার পরপার পুরুরাজের অধিকারে। তিনি গুপ্তচর-মুখে সংবাদ পাইয়াছেন যে, পুরুরাজ বীরপুরুষ, তিনি ত্রিশ হাজার পদাতিক, চার হাজার অশ্বারোহী, তিন শত রথ এবং দুই শত মদমত্ত হস্তী লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তাহার উপরে সম্মুখে প্রশস্ত নদী, এখন আষাঢ় মাসের শেষে নদী বন্যাময়ী, পরাক্রমশালী শত্রুর উপস্থিতিতে নদী পার হইবার উপায় তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশ্যই শত্রুর অগোচরে নদী

পার হইতে হইবে, তাহার জন্ত রাত্রির প্রয়োজন; নৌ-সেতু প্রস্তুত করিবার সময় পাওয়া যাইবে না, সেজন্ত নদীর একটা অগভীর স্থান আবিষ্কার করা প্রয়োজন। তাঁহার সৈন্ত-সামন্তগণ যখন তক্ষশিলার নারী-বিক্রয়-বিপণীতে আত্মবিনোদনে মগ্ন, সেকেন্দর শা তখন সৈন্ত-তরণযোগ্য স্থান সন্ধান করিয়া নদী-তীরে একাকী অশ্বারোহণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই পর্যন্ত ইতিহাস। এর পরে আমাদের গল্প।

২

মাসিডন হইতে যে সৈন্ত-বাহিনী লইয়া সেকেন্দর শা বাহির হইয়াছিলেন, তাহারা সকলে তক্ষশিলায় পৌঁছায় নাই। কিছু যুদ্ধে হতাহত হইয়াছে, আর অনেকে পথের যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া যে বিপুল জনসঙ্ঘ ভারতে প্রবেশ করিয়াছে—তাহাকে দেখিলে সেকেন্দর শার সৈন্তসংখ্যা সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মিবে। এই জনসমাবেশের সামান্ত অংশই সৈন্তদল, বাকি অধিকাংশই বে-সরকারী জনতা।

এই জনতার মধ্যে স্ত্রী আছে, পুরুষ আছে, গ্রীক আছে, পারসীক আছে। লাঙলের ফলা ভূমি কর্ষণ করিয়া গেলে তাহাকে অনুসরণ করিয়া যেমন খড়-কুটা, তৃণখণ্ড চলিতে থাকে, তেমনি দিগ্বিজয়ীর অগ্রাক্রান্ত পথ অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন দেশের বিচিত্র লোক আসিয়াছে। কেহ ক্রয় বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, কেহ সৈন্তদলে গৃহীত হইবার আশায় আসিয়াছে, কেহ যুদ্ধক্ষেত্রে লুঠ করিবার আশায় আসিয়াছে, কেহ বা কৌতূহলে আসিয়াছে, আর অনেকে কিছু করিবার নাই বলিয়া শুধু শুধুই আসিয়াছে। এই জনতা বেসরকারী হইলেও সৈন্ত-বাহিনী ইহাদের উপরে অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। খাদ্য, বস্ত্র ও অন্তান্ত আবশুক দ্রব্যের জন্ত ইহাদের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। এক মুদ্রার দ্রব্য পাঁচ মুদ্রা মূল্যে ইহারা বিক্রয় করে। চোরাকারবার একালের মতো সেকালেও ছিল, উহা হালের আমদানী নয়, চৌর্যব্যবসায়ের মতোই উহা

নিতান্তই সনাতন। মোটকথা, এইজন্যই সেকেন্দর শার সৈন্য-বাহিনীর কমি-শারিয়েটও চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্র। নিতান্ত শিশু ও অশক্ত বৃদ্ধ ব্যতীত আর সব বয়সের নরনারীই এই জনতার অন্তর্ভুক্ত আগেই বলিয়াছি।

৩

অন্ধকার রাত্রির প্রথম প্রহর। এখনো চাঁদ ওঠে নাই, মেঘ উঠিয়াছে, আষাঢ় মাসের রাত্রে যেমন হইয়া থাকে। বিতস্তার নির্জন তীরভূমি বাবলা-জাতীয় বৃক্ষে আচ্ছন্ন; তীরভূমি নির্জন, কিন্তু নির্জীব নয়, প্রথম প্রহরের ঘোষ কিছুক্ষণ আগে প্রহর হাঁকিয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে এক আধ বার চকিত শৃগালের পদশব্দ শ্রুত হয়, এক আধ বার তাহার ভীত তীক্ষ্ণ ডাক ধ্বনিত হয়—তা' ছাড়া সব নিস্তব্ধ। দূরে তক্ষশিলা নগরীর কোলাহল ও দীপমালার আভা ঠাহর করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। আগেই বলিয়াছি, এই রকম সময়ে—এই রকম স্থানে সেকেন্দর শা সৈন্য-তরণযোগ্য স্থান সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিলেন। কিছুক্ষণ চলিবার পরে বাবলাবনে অশ্বচালনা অসম্ভব দেখিয়া একটি গাছের সহিত ঘোড়া বাঁধিয়া তিনি পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। সেই সময়ে অন্ধকারের মধ্যে আর একজন লোক ইতস্তত ঘুরিতেছিল। সতর্কভাবে নিরীক্ষণ করিলে বোঝা যায় যে, লোকটি যুবক, যুবকটি বীর, তাহার অবয়ব ও অস্ত্রশস্ত্রেই তাহা সপ্রমাণ। তাহার ডান কাঁধ হইতে একখানা সুদীর্ঘ সরল অসি শরীরের বাম দিকে নামিয়া গিয়াছে, বাম হাতে অশ্বারোহীর ত্রিকোণ ঢাল, অশ্ব নাই, যুবক পদব্রজী। আরও সতর্কতার সহিত দেখিলে বোঝা যাইবে, তাহার পা পাদুকাহীন, তাহার অধোবাস জানু অবধি ভেজা; যুবা এইমাত্র জল হইতে উঠিয়াছে, খুব সম্ভব দূর দেশ হইতে আগত, পোষাকে নানা রঙের ধূলা। একদিনে নিশ্চয় অনেক দিনের পথ অতিক্রম করিয়াছে; অশ্ব ব্যতীত এমন সম্ভব নয়। তাহার সিক্ত বস্ত্রেই বর্তমান অশ্বাভাবের রহস্য, ঘোড়াটিকে পরপারে রাখিয়া যুবক একাকী নদী পার হইয়াছে।

বাবলা-বনের প্রান্তে দাঁড়াইয়া যুবা দূরবর্তী তক্ষশিলার দীপমালা লক্ষ্য করিল, তারপরে দ্রুত চলিতে সুরু করিল। কিছুক্ষণ চলিবার পরে সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল—কান পাতিয়া শুনিল—অন্ধকারের মধ্যে অদূরে আর্তস্বর। আবার শুনিল, আবার সেই আর্তস্বর এবং সেই স্বর নারী-কণ্ঠের। যুবক সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া ছুটিল, কিন্তু বেশী ছুটিতে হইল না, দেখিল—একটি অশ্ব মাঝারি বেগে আসিতেছে, সেই অশ্বপৃষ্ঠে আর্তধ্বনি।

যুবক অগ্রসর হইয়া ঘোড়ার বল্গা ধরিয়া ফেলিল, বাধা পাইয়া ঘোড়া থামিল, ঝাঁকুনি খাইয়া ঘোড়ার পিঠ হইতে কে একজন পড়িয়া গেল, আর্তস্বর এবার ভূপতিত। এ সমস্তই লহমার মধ্যে ঘটিয়া গেল।

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে একজন লোক, সেও যুবা এবং কোমরবন্ধের অসিতে মনে হয় বীর পুরুষ, অবতরণ করিল, আর বল্‌গাধারী যুবককে শুধাইল—কে তুমি? আমার অশ্বরোধ করিলে কেন?

বল্‌গাধারী বলিল—আমার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু তুমি যে চোর, তাহা বুঝিয়াছি, এই রমণীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলে।

যুবকটি বলিল—আমি চোর নই, আমি গ্রীক।

পূর্ববর্তী যুবক হাসিয়া বলিল—বেশ, তা-ই হইল, তুমি গ্রীক চোর।

এবারে গ্রীক যুবকটি বলিল—তোমার দুঃসাহসের অন্ত নাই, তুমি দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর শার অনুচরদের চোর বলিতেছ?

—চোরের অপর নাম আমাদের দেশে নাই। জিজ্ঞাসা করি, পরস্বাপহরণ করিতেছ কেন?

গ্রীক যুবা বলিল—এবারে ভুল হইল, রমণী পরস্ব নয়, ও গ্রীক।

—গ্রীসে বুঝি পরের দ্রব্য লইলে চুরি হয় না।

—তাহার উত্তর পাইতে চাও তো গ্রীসে চলো। এখন পথ ছাড়ো—

এই বলিয়া সে রমণীর দিকে অগ্রসর হইল।

ভারতীয় যুবক পথরোধ করিয়া বলিল—থামো।

গ্রীক যুবক বলিল—তোমার কি প্রাণ হারাইবার ভয় নাই?

—সে ভয় উভয়ত:।

—গ্রীক কখনো যুদ্ধ করিতে ভয় পায় না।

—এবং পরস্বাপহরণ করিতেও বটে।

শ্লেষের আঘাতে যুবক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিল—তবে বর্বর, তোর তরবারি খোল্।

ভারতীয় যুবক বলিল—বেশ, তাই খুলিতেছি। কিন্তু আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি, আমাকে বর্বর বলিয়া মনে হইল কেন?

—তা' জানো না? জগতে দুইটি জাতি আছে, গ্রীক আর বাকি সব বর্বর! এবারে বুঝিলে?

—গ্রীক-সভ্যতার পরিমাপ বুঝিলাম! তারপরে শুধাইল—তরবারি খুলিব কি?

—যদি ভয় না পাইয়া থাকো!

ভারতীয় যুবক স্কন্ধ হইতে অসি উন্মোচিত করিল, গ্রীক যুবক আগেই কোমরবন্ধনীর অসি খুলিয়াছিল।

গ্রীক অসি হ্রস্ব, ছোরার চেয়ে কিছু বড়, ভারতীয় অসি প্রায় তিন হাত।

গ্রীক যুবক বলিল—তোমার অসি অনেক বড়, এ অসম যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত নয়।

—বর্বরের নিকটে ন্যায়ের আশা করো কেন? যাই হোক, তোমার অসিখানা দেখি! ভয় নাই, আমরা নিরস্ত্রকে আঘাত করি না, আমরা গ্রীক নই।

গ্রীক যুবক ক্রমেই ধৈর্যহীন হইতেছিল, কিন্তু নিরুপায়, নিজের অসি ভারতীয়ের হাতে দিল।

ভারতীয় যুবক গ্রীক অসির মাপে নিজের অসিখানা মাপিয়া ভাঙিয়া ফেলিল, তারপরে গ্রীকের হাতে তাহার অসি ফিরাইয়া দিয়া শুধাইল, এইবারে হইল তো! এখন আর নিশ্চয় অন্যায় যুদ্ধ হইবে না?

গ্রীক যুবকটি প্রতিপক্ষের শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল, আলো থাকিলে দেখা যাইত যে, তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে।

এবারে ভারতীয় যুবকটি বলিল—অন্ধকারে তোমার অসুবিধা হইবে না ?

গ্রীক বলিল—আমার কাছে চকমকি আছে, মশাল নাই।

—সেই তো স্বাভাবিক, চোরের পক্ষে মশাল অনাবশ্যক—গৃহস্থের পক্ষে মশাল দরকার।

এবারে রমণী প্রথম কথা বলিল, সে বলিল—চকমকি আমার হাতে দাও, আমি আলো জ্বালিয়া দিতেছি।

গ্রীক যুবক ঘোড়ার জিনের তলদেশ হইতে চকমকি ও শোলা বাহির করিয়া ভারতীয়ের হাতে দিল, ভারতীয়ের হাত হইতে রমণী লইল। তারপরে অনায়াসে আপন বর্হিবাস ওহাড়নী খুলিয়া চকমকির আগুনে ধরাইয়া যুবকদ্বয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। হঠাৎ আলো জ্বলিয়া ওঠাতে বাবলা গাছের একদল পাখী কিচমিচ করিয়া উঠিল, অদূরবর্তী একটা কৌতূহলী শৃগালের পীতাভহরিৎ চক্ষুতারা ঝকমক করিয়া উঠিল, নিকটবর্তী ভূমি যেমন আলোকিত হইল, দূরবর্তী অন্ধকার তেমনি নিবিড়তর হইল।

কিন্তু যে জন্য এ আয়োজন, তাহাতেই ক্ষণকালের জন্য বাধা পড়িল—যুদ্ধ-বাসনা ভুলিয়া দ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বী রমণীর মুখে বদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে-রূপ হিংসা ভুলাইয়া দিতে পারে, তাহা দৈহিক নয়, তাহা আত্মার জ্যোতি। ট্রয় অবরোধকালে কৌতূহলী হেলেন যখন নগরপ্রাকারে উঠিত, গ্রীক ও ট্রয়-বাহিনী তখন জিঘাংসা ভুলিয়া, জিগীষা ভুলিয়া নিশ্চয় এমনি ভাবে মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিত।

৪

মোহ কাটিলে ভারতীয় যুবক বলিল—এবার এসো।

গ্রীকের মোহভাব তখনো সম্পূর্ণ কাটে নাই, সে আপন মনেই বলিয়া উঠিল—অন্ধকারেও ভুল করি নাই।

কথাটি ভারতীয়ের কানে গেল, সে বলিল—অভ্যস্ত চোরের চক্ষু অন্ধকারেও ভুল করে না।

শ্লেষের আঘাতে গ্রীকের মোহ সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল, উদ্যত অসি লইয়া সে আক্রমণ করিল, ভারতীয় যুবক প্রতিরোধ সুরু করিল। সৌন্দর্যকে সাক্ষী করিয়া গ্রীক ও ভারতীয়ের ইহাই প্রথম অস্ত্র-বিনিময়।

দু'জনেই অসি-চালনায় সুনিপুণ, তবে ভারতীয় যুবকটি মাথায় বেশি উঁচু, ঐখানে তাহার সুবিধা, তার উপরে গ্রীক যুবকটি আজ প্রথম হইতেই বিড়ম্বিত, কাজেই সে অভ্যস্ত নিপুণতা দেখাইতে পারিতেছে না; তাই বলিয়া সে যে কুণ্ঠিত, এমন মনে করিবার কারণ নাই। তাহার হাত ও মুখ দুই-ই চলিতেছে, হাত বেশী চলিলে আজ সে জিতিত।

ভারতীয়কে একবার অসি দ্বারা আঘাতের চেষ্টা করিতে করিতে গ্রীক যুবক শুধাইল— বর্বর, তোমাকে দাহ করিব, না মাটিতে পুঁতিব?

—সে চিন্তা করিবার সুযোগ হইবে না।

—তবু শুনিয়া রাখি। ইলিয়াড কাব্য পড়িলে জানিতে পারিতে, আমরা নিহত শত্রুর সৎকার-সংস্কারে সাহায্য করিয়া থাকি।

ভারতীয় যুবক তাহাকে অসি দ্বারা আঘাত করিয়া বলিল—তোমাদের সংস্কার কি, বলিয়া রাখো।

—আঃ! গ্রীক যুবকটি আহত হইল।—গ্রীকরা পরাজয় স্বীকার করে না।

—কিন্তু পলায়ন করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আহত, পর্যুদস্ত যুবকটি রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলাইল।

তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এবারে রমণী কথা বলিল,—কি করিতেছ! অনুসরণ করিয়া উহাকে হত্যা করো।

—পলায়নপরকে আমরা বধ করি না, তা ছাড়া চারি দিক যে অন্ধকার।

সত্যই অন্ধকার। রমণীর ওড়্হনী জ্বলিয়া নিভিয়া গিয়াছে। ক্ষণিক আলোকের অবসানে চতুর্দিক ঘনতর অন্ধকার।

যুবকটি রমণীকে বলিল—চলো, তোমাকে স্বজনগণের মধ্যে রাখিয়া আসি।

রমণী এতক্ষণে ভীত হইয়াছে, বলিল—না, না, সে হইবে না, আজ রাত্রে

আমি কিছুতেই নগরের দিকে যাইব না, বরঞ্চ আমাকে তোমার স্বজনগণের মধ্যে রাখিয়া এসো।

—আমার স্বজনগণ এখানে কোথায় ?

—কোথায় তোমার দেশ ?

—এই মহাদেশের প্রায় পূর্বপ্রান্তে।

—ঐ নদীর পরপারে ?

—ঐ রকম শত শত নদীর পরপারে।

বিস্মিতা রমণী বলিল—এদেশ আমাদের গ্রীসের চেয়েও বড় দেখিতেছি। তারপরে একটু থামিয়া বলিল—তুমি যেখানে থাকো, সেখানে লইয়া চলো।

যুবক অন্ধকারের মধ্যে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—আমি নদীর মধ্যে দ্বীপের ঐ পাহাড়টার গুহার মধ্যে থাকি।

—ওখানে ! ওখানে কেন ?

—সে অনেক কথা। তবে এখন এইটুকু শুনিয়া রাখো যে, আমি তক্ষশিলায় আসিতেছিলাম। কালকার রাত্রি ঐ গুহায় কাটাইয়াছি, আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে তক্ষশিলা পৌঁছিব ভাবিয়াছিলাম, মাঝপথে এই ঘটনা।

—ভাগ্যে তোমার দেখা পাইয়াছিলাম, নতুবা আমার কি হইত !

—এখন কি করিবে বলো ?

—আমাকে তোমার গুহায় লইয়া চলো।

—ভয় করিবে না ?

—ভয় ? তুমিই তো ভয় হইতে উদ্ধার করিলে।

—আর কোন ভয় নাই তো ?

—সে তুমি জানো—

এই বলিয়া রমণী হাসিল।

—ভালো, তবে আমার সঙ্গে এসো। তখন দুইজনে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদূর চলিবার পরে দেখিতে পাইল যে, একটি গাছে একটি ঘোড়া বাঁধা

রহিয়াছে। যুবক ভাবিল—এ মন্দ হইল না, একটা ঘোড়াও জুটিয়া গেল। কিন্তু ভাবিল, পরের ঘোড়া লওয়া যে পরস্বাপহরণ!

তাহার ইতস্তত: ভাব দেখিয়া রমণী বলিল—এ বোধ হয়, সেই লোকটার ঘোড়া।

—তবে লইতে পারি। আততায়ীর ঘোড়া লওয়া পরস্বাপহরণ নয়।

রমণী শুধাইল—তোমার ঘোড়া কি হইল? অস্ত্র দেখিয়া তোমাকে তো অশ্বারোহী মনে হয়।

যুবক বলিল—আমার ঘোড়া নদীর পরপারে ছাড়িয়া দিয়াছি। আমার বিশ্বাস ছিল যে, নদীতে যখন অনেক জল, ঘোড়া পার হইবে না, কিন্তু এই দ্বীপটা থাকাতে এখানে জল কম, হাঁটিয়া পার হওয়া যায়, আমি হাঁটিয়া পার হইয়াছি। ঘোড়াটাও হাঁটিয়া পার হইতে পারিবে।

একটু থামিয়া বলিল—সঙ্গে একটা ঘোড়া থাকা ভালো।

তখন সে ঘোড়াটাকে খুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইল। অশ্বটি তেজস্বী, বীরের স্পর্শে সে অভ্যস্ত, যুবকের স্পর্শে বুঝিল, যুবক যেই হোক, সে বীর পুরুষ। নদীতীরে আসিয়া যুবক রমণীকে বলিল—তুমি ঘোড়ায় চড়ো, আমি উহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাই, নতুবা তুমি পায়ে আঘাত পাইবে, কাপড়-চোপড়ও ভিজিয়া যাইবার আশঙ্কা।

বাক্যব্যয় না করিয়া রমণী ঘোড়ায় চড়িল, যুবক তাহার বল্‌গা ধরিয়া আগে আগে সাবধানে চলিল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্বীপটিতে গিয়া পৌঁছিল, জল কোথাও জানুর বেশী নয়।

রমণী নামিল, বলিল—হাঁটিয়া আসিলেও চলিত দেখিতেছি, জল এখানে সামান্য।

যুবক বলিল—শুধু এখানে নয়, দ্বীপের ওদিকটাতেও জল সামান্য, নদী এখানে অনায়াসে হাটিয়া পার হওয়া সম্ভব, আমি গতকাল হাঁটিয়াই পার হইয়াছি।

—অথচ নদীতে এখন বন্যা, সর্বত্র গভীর জল।

—এ দ্বীপটা একটা ডোবা পাহাড়ের অংশ, মাঝখানে এই পাহাড়টা থাকায় জল এখানে অগভীর।

এই সব কথা বলিতে বলিতে তাহারা গুহামুখে আসিয়া পৌছিল। ঘোড়াটিকে একটি পাথরের সঙ্গে বাঁধিয়া যুবক বলিল—দাঁড়াও, আলো জ্বালি, গুহার মধ্যে চকমকি ও শোলা আছে।

রমণী দাঁড়াইলে যুবক চকমকির সাহায্যে শুকনা কাঠে আগুন জ্বালিল। রাত্রে প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া দিনের বেলাতেই কাঠের টুকরা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। আলোতে গুহার ভিতরটা প্রকাশ পাইল, মাঝারি আকারের গুহা, নীচের পাথর সমতল, তার উপরে খান দুই কম্বল, একটি জলপাত্র, পাশে কিছু ফল-মূল—আর কোথাও কিছু নাই।

যুবক বলিল—আমার রাজপ্রাসাদ দেখিলে তো?

রমণী অতিশয় বুদ্ধিমতী, বলিল—তুমি কি রাজার ছেলে?

—একথা কেন শুধাইতেছ?

—তোমার মুখে ঐ রাজপ্রাসাদ শব্দটা শুনিয়া।

যুবক একটু দ্বিধা করিয়া বলিল—না, আমি রাজপুত্র নই।

রমণী এবার বলিল—তবে তোমার রাজা হইবার ইচ্ছা আছে?

—রাজা হইতে কাহার না ইচ্ছা?

যুবকের পরিহাসে রমণী হাসিল, রমণীর হাসিতে যুবকটি হাসিল, পৌরুষ আর সৌন্দর্য যখন একযোগে হাসে, দেবতারা সে দৃশ্য উপভোগ করিয়া ধন্য জ্ঞান করেন।

যুবক শুধাইল—কি, এখানে রাত্রিবাস করিতে রাজি তো? এখনো বলো, তোমাকে তক্ষশিলায় রাখিয়া আসি।

—আমি এখানেই থাকিব—বলিয়া রমণী গুহা-মধ্যে ঢুকিয়া কম্বলের উপরে উপবেশন করিল, অগত্যা যুবা পুরুষও প্রবেশ করিল।

৫

অগ্নিকুণ্ড নিভিয়া গেলে ভারতীয় যুবক ও গ্রীক রমণী কম্বলশয্যায় পাশাপাশি শয়ন করিল। চরাচর নিস্তব্ধ ও নির্জন। কেবল কান পাতিয়া থাকিলে শোনা যায় যে, বিতস্তার পশ্চিম তীরে প্রহরী গ্রীক সৈন্যেরা তখন পাশ্চাত্যখণ্ডের আদিকবি হোমারের ইলিয়াডগাথা গান করিতেছে, আর পূর্বতীরে পুরুরাজের প্রহরী ভারতীয় সৈন্যেরা প্রাচ্যখণ্ডের আদি কবি বাল্মিকীর রামায়ণ কাব্য গান করিতেছে—আর তাকাইয়া থাকিলে গুহামুখের আকাশে আকাশপ্রান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উৎসুক সপ্তর্ষিগণ মহালগ্ন সমাসন্ন জানিয়া সকৌতূহলে অপেক্ষা করিয়া আছেন। দুই আদি কবির মাঙ্গল্য মন্ত্রের সঙ্গীতে, অনাদিকালের নক্ষত্রলোকের সাক্ষ্যে এই মুষ্টিমেয় গুহা-মধ্যে ভারত ও যুনানীমণ্ডলের বসনাঞ্চলে গাঁটছড়া বাঁধা হইয়া গেল।

রাত্রি আরও গভীর হইল। আদিকবির কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল, সপ্তর্ষিগণ স্নানার্থে মানসযাত্রা করিলেন, কেবল কন্দর্পের স্বর্ণোজ্জ্বল সিঁধকাঠির মতো কৃষ্ণদশমীর তীক্ষ্ণ চন্দ্রকলার আকাশের প্রান্তে সুড়ঙ্গ খুঁড়িবার আর বিরাম হইল না।

নিশান্তের অন্ধকার থাকিতেই যুবক-যুবতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, দুইজনে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

তখন যুবক শুধাইল—তোমার নাম কি? রমণী বলিল—ক্লিওফিস (Kleophis)। যুবক উচ্চারণ করিল—ক্লিওফিস। এবারে রমণী শুধাইল—তোমার নাম কি?

যুবক বলিল—চন্দ্রগুপ্ত।

রমণী উচ্চারণ করিল—স্যাণ্ট্রাকোটাস্ (Santrakottas)।

উচ্চারণ করিয়াই রমণী বুঝিল—হয় নাই, অপ্রস্তুত হইয়া হাসিল।

তাহার হাসিতে যুবকটিও হাসিল, বলিল—ঠিক হইয়াছে।

তখন দুইজনে গুহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে আসিবামাত্র রমণী বিস্ময়ে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল—এ কি করিয়াছ?

—কেন, কি হইয়াছে ?

—এ কার ঘোড়া আনিয়াছ ?

—কেন ? কার ?

—এ যে স্বয়ং মাসিডনপতি সেকেন্দর শার ঘোড়া ! কে না চেনে ? সর্ব্বনাশ !

ভয়ে সে বসিয়া পড়িল।

যুবক ভীত হইবার লক্ষণ দেখাইল না, বলিল—এ তো শুভ লক্ষণ ! দিগ্বিজয়ী রাজার ঘোড়া ঘরে আনিয়াছি, আমিই কোন্ দিগ্বিজয়ী রাজা না হইব ?

—না, না, পরিহাস নয়। ওকে এখনি ছাড়িয়া দাও—

তারপরে সবিস্ময়ে বলিল—আমি ভাবিতেছি, ও তোমার সঙ্গে আসিল কেন ?

—ও বুঝিয়াছে, কালক্রমে আমিও দিগ্বিজয়ী রাজা হইব, তাই আসিয়া আজ আমার রাজপ্রাসাদটা দেখিয়া গেল।

কিন্তু এই পরিহাসেও রমণীর ত্রাস কমিল না, তখন যুবকটি বলিল—চলো, নদীর তীরে উঠিয়া ওকে ছাড়িয়া দিতেছি।

তারপরে বলিল—ভয় পাইও না, রাজার ঘোড়া রাখিব না, খাইতে দিব কি ? নিজেই খাইতে পাই না।

তখন তাহারা ঘোড়াটিকে লইয়া বিতস্তার পশ্চিম তীরে আসিয়া উঠিল এবং ঘোড়াটিকে ছাড়িয়া দিল। অশ্ব তক্ষশিলার অভিমুখে ছুটিল।

যুবক যুবতীও ভিন্ন পথে তক্ষশিলার দিকে চলিল।

সেকেন্দর শা পুনরায় আজ অপরাহ্ণে অশ্বারোহণে নদীতীরে আসিয়াছেন। গোপনে সৈন্যতরণ-যোগ্য স্থান এখনও খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহার দৃষ্টি পর-পারের দিগন্তে নিবদ্ধ, মর্ম্মর-কঠিন ললাটের অভ্যন্তরে ইতিহাসের ক্রান্তিপাতী তরঙ্গের ওঠাপড়া চলিতেছে ; বল্গা শিথিলভাবে ধৃত, ঘোড়া আপন মনে চলিবার সুযোগ পাইয়াছে।

সেকেন্দর শার দৃষ্টি যখন ঘোড়ার দিকে ফিরিয়া আসিল, দেখিলেন যে, ঘোড়া নদীর একটি নির্জন স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। নদীর মধ্যে একটি দ্বীপ। ঘোড়া আপন মনে নদীতে নামিতে লাগিল, কৌতূহলী বীর বাধা দিলেন না, ঘোড়া

অনায়াসে নদী হাঁটিয়া পার হইয়া দ্বীপটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেকেন্দর শা আনন্দিত বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিলেন—এত দিন তো তিনি এই স্থানটিরই সন্ধান করিতেছিলেন। তাঁহার অভ্যস্ত দৃষ্টির বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, দ্বীপের ওদিকেও জল অগভীর। এবারে গোপনে সৈন্যতরণযোগ্য স্থান পাওয়া গেল!

সেকেন্দর শা ভাবিলেন, ঘোড়া এ স্থানের সন্ধান পাইল কি ভাবে? তখনি তাঁহার কাল রাত্রে ঘোড়ার অকস্মাৎ অন্তর্ধানের ও সারা রাত্রি অনুপস্থিতির ঘটনা মনে পড়িল। তিনি স্থির করিলেন—আর কিছুই না, ঘোড়াটা উপলক্ষ্য মাত্র, তাঁহার সঙ্কট বুঝিতে পারিয়া তাঁহার পূর্বপুরুষ বীর হারকিউলাস ঘোড়াটাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে। নতুবা ঘোড়াটার কি সাধ্য! তখন তিনি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় হারকিউলাসের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানাইলেন এবং তখনি হৃষ্টচিত্তে তক্ষশিলার অভিমুখে ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া যাত্রা করিলেন।

অসমাপ্ত কাব্য

সম্প্রতি যুবরাজ কুমারগুপ্ত হূণদের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বয়ং সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলেন ; সীমান্ত অবধি যাওয়া সম্ভব হয় নাই, সীমান্ত বহুদিনের পথ, তিন দিনের পথ অগ্রসর হইয়া গিয়া যুবরাজকে স্বাগত করিলেন। পিতা ও পুত্রে সাক্ষাৎ হইলে, যুবরাজ পরাজিত হূণ সেনাপতির বিচিত্র অসি মহারাজার পদপ্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি আশীর্বাদ করিলেন,—বৎস, তুমি সর্বজয়ী হও।

মহারাজকে অভিবাদন সারিয়া কুমারগুপ্ত অন্যান্য রাজসঙ্গীর সহিত যথোপযুক্ত প্রণাম ও সম্ভাষণাদি করিলেন। প্রথমে কুলগুরুকে, পরে রাজ-পুরোহিতকে প্রণাম করিলেন, মহামাত্যকে নমস্কার করিলেন, প্রধান ধর্মাধিকরণকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং সবশেষে রাজসভার যুবক কবিকে সখ্যভাবে সম্বোধন করিলেন,—এই কবি ও কুমারগুপ্ত প্রায় সমবয়সী। কবি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া 'হূণারি' বলিয়া সম্বোধন করিল।

'হূণারি' ঐ শব্দটি অদূরবর্তী মহারাজার কানে গেল, তাঁহার বড় ভাল লাগিল, তিনি দেখিলেন, ঐ শব্দ কে উচ্চারণ করিল, সহজেই বুঝিতে পারিলেন, ঐ প্রতিভার উদ্গাতা রাজসভার যুবক কবি ছাড়া আর কেহ নয়। তিনি মনে মনে কবির প্রতি আরও সন্তুষ্ট হইলেন ; কেন না, প্রিয়জনকে যে যোগ্য সম্বর্ধনা করে, সেও প্রিয় হইয়া ওঠে।

এই যুবক কবি রাজসভাতে নবাগন্তুক। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিভাবলে সে রাজার প্রিয়পাত্র এবং রাজকুমারের প্রিয় সখা হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্যই তিনি রাজসভার প্রাচীন কবি ও পণ্ডিতগণকে উপেক্ষা করিয়া

নবাগন্তুক এই যুবককেই সঙ্গে আনিয়াছেন। নবীনের প্রতি এই অহেতুক সম্মান প্রকাশে প্রাচীনেরা তর্ক তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাট্ বলিয়াছিলেন, বয়স কাহারো অধীন নয়, এই কবির বয়স অল্প সত্য, কিন্তু প্রতিভায় সে কাহারো ন্যূন নহে, আর কবির মধ্যে আমরা প্রতিভার সম্মান করি, বয়সের নয়।

তারপরে তিনি বলিলেন—তাঁহার সেই সুধাক্ষরী অপূর্ব নাটকখানির কথা কি আপনারা ভুলিয়া গেলেন।

প্রাচীনেরা আর কি উত্তর দিবেন! তখন তাঁহারা সকলেই নাটকখানির প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন।

কবি রাজসভায় প্রথম আসিবার অল্পদিন পরেই চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে একখানি নাটক রচনা করিতে তিনি কবিকে আদেশ করেন। বলেন যে, যুবক! অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তোমাকে কবিরূপে গ্রহণ করিয়াছি। এবারে যে সুযোগ পাইলে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ভুলিও না।

সুযোগের অপব্যবহার কবি করে নাই। এই উপলক্ষ্যে লিখিত বিক্রমোর্বশী নাটক রসিকসমাজকে সাধারণ ভাবে ও নবগৃহীত-অভিধা স্বয়ং বিক্রমাদিত্যকে বিশেষভাবে প্রীত করিয়াছিল। তারপর হইতে যুবকের প্রতি মহারাজার স্নেহ সবিশেষ বর্ধিত হইল। অনুক্ষণ তাহাকে তিনি সঙ্গে রাখিতেন, এখনও সঙ্গে আনিয়াছেন।

সৎ কাব্য রচনার ক্ষমতা ছাড়া কবির আর একটি বিশেষ গুণ ছিল, যে জন্য সে কাব্যরসিক মহারাজা ও যুবরাজের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

সাধারণ লোকের পক্ষে নিশ্বাস প্রশ্বাস যেমন সহজ, কবির পক্ষে সরস ও হৃদয়গ্রাহী বাক্যপ্রয়োগ তেমনি অনায়াস ছিল। অনেক কবি সৎকাব্য লেখেন বটে, কিন্তু অন্য সময় তাঁহারা অত্যন্ত নীরস। ইহার স্বভাব স্বতন্ত্র, সর্বদা একটি রসের পরিমণ্ডল যেন ইহার চারি দিকে বিরাজিত, সৎকাব্যও তাহারই অন্তর্গত। চাঁদ সুধা ধরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার জ্যোৎস্না কেন ধরিয়া রাখে না, রাখিলে তাহাতেও সুধার স্বাদ পাওয়া যাইত। তাহার বিদগ্ধ বাক্প্রবাহের যে

অনায়াস সরসতায় সকলে আনন্দিত হইত, তাহা কেহ সঞ্চয় করিয়া রাখিত না, রাখিলে এমন কত কাব্য ও নাটক হইতে পারিত। তাহা হয় নাই বটে, কিন্তু কবি নিজে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। মহাকবিগণের সঙ্গ কখনোই নীরস হতে পারে না।

ঐ হূণারি শব্দে অনেক কথাই মহারাজার মনে পড়িল; মনে পড়িল, প্রাচীনগণের বাধার বিরুদ্ধে তাহাকে গ্রহণ; মনে পড়িল, প্রাচীন সভাকবি দেবভট্টের সুস্পষ্ট ঈর্ষা সত্ত্বেও নবাগন্তুকের উপরে নাটক রচনার ভার সমর্পণ; মনে পড়িল, বিশ্রম্ভক্ষণের আনন্দদায়ক তাহার অজস্র কৌতুকস্ফুরী বিদগ্ধ সুভাষিতাবলী—অবশেষে মনে পড়িল, ঐ হূণারি শব্দটি! কত স্বল্পে, কত সংক্ষেপে, কত অনায়াসে সকলের মনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে উহাতে। প্রাচীন দেবভট্ট মাথা কুটিয়া মরিলেও উহা বাহির হইত না। মহারাজা স্থির করিলেন, কুমারকে 'হূণারি' উপাধিতে ভূষিত করিবেন আর সেই উপলক্ষ্যে কবিকে একখানি কাব্য রচনা করিতে আদেশ দিবেন।

২

রাজধানীতে ফিরিয়া মহারাজা ঘোষণা করিলেন যে, হূণজয়ী যুবরাজ কুমারগুপ্তকে তিনি 'হূণারি' উপাধিতে ভূষিত করিবেন। এই সংবাদে রাজধানীর উচ্চনীচ সকলেই খুশী হইল। খুশী হইবার কথাই তো, যুবরাজ সকলের প্রিয়পাত্র, তাঁহার গৌরবে সকলেরই গৌরব। তা ছাড়া অন্য কারণও আছে। এই উপলক্ষ্যে রাজধানীতে জনসমাগম হইবে, কেনাবেচায় বিলক্ষণ দু' পয়সা লাভ হইবে; যাহাদের কিনিবার বেচিবার নাই, তাহারা এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কত কৌতুক তামাসা দেখিতে পাইবে, আর ফলাহারের তো কথাই নাই, রাজবাড়ীর ব্যাপার, সে এক 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' ব্যাপার, কেহই বাদ পড়িবে না।

মহারাজার আদেশে দূর দূরান্তে নিমন্ত্রণপত্রসমূহ প্রেরিত হইল। হূণযুদ্ধে

যে-সব সামন্ত নৃপতিগণ সাহায্য করিয়াছিল, তাহারা আসিবে; সাম্রাজ্যের বাহিরে যে-সব স্বাধীন নৃপতি আছে, তাহারাও আসিবে; ছোট বড়, আহূত অনাহূত, রবাহূত, কেহই বাদ পড়িবে না।

একদিন রাজসভায় মহারাজা যুবক কবিকে বলিলেন—কবি, উপাধিদান উপলক্ষ্যে তোমাকেও কিছু কাজের ভার দিব

কবি বলিল—মহারাজার অর্পিত ভার মহারাজার প্রদত্ত মালার মতোই গৌরবে মস্তকে বহন করিব।

সম্রাট্ বলিলেন—তোমাকে একখানি কাব্য রচনা করিতে হইবে।

কবি বলিল—যে-আজ্ঞা, মহারাজ!

—তোমাকে বিশদভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই, তুমি রসজ্ঞ, উপলক্ষ্যের মর্ম তুমি জানো, অধিক বলা অনাবশ্যক, যেহেতু কল্পনাহীন ব্যক্তিকেই বুঝাইয়া বলিবার দরকার হয়

—মহারা , আপনার কথাগুলি আমার সম্বন্ধে সত্য না হইলেও মধুর, উহাতে আমার পরিচয় না থাক, আপনার পরিচয় অবশ্যই আছে।

তারপর কবি বলিল—আপনার কাছে একটি প্রার্থনা আছে। সে প্রার্থনা পূরণ হইবার আশা আছে কি না জানি না, কিন্তু পূরণের আশা না থাকিলেও মহতের কাছেই যাজ্ঞা করিতে হয়, অধমের কাছে কখনোই নয়। কাব্য রচনার জন্য কিছু সময় দিতে হইবে।

—অবশ্যই সময় পাইবে। উৎসবের এখনো বিলম্ব আছে।

—অনুগৃহীত হইলাম, মহারাজ!

রাজা ও কবিতে যখন এইরূপ আলাপ হইতেছিল, তখন অদূরে উপবিষ্ট দেবভট্ট ঈর্ষ্যায়, ক্ষোভে, সংসারে ন্যায়বিচারের অভাবে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিল। তাঁহার প্রতি কাব্যরচনার ভার পড়িল না, পড়িল ঐ নবাগন্তুক গ্রাম্য কবিটার উপরে—ইহাতেই তিনি নতমস্তক হইয়াছিলেন। তারপরে যখন কবির মুখে মধুক্ষরী বাক্য বাহির হইতে লাগিল, তিনি স্থির করিলেন, লোকটা ঐ সব বাক্য সংগ্রহ করিয়া সভায় আসে, নতুবা অকস্মাতের তাগিদে মানুষ যে

এমন ভাবে কথা বলিতে পারে, তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু বিপদ্ এই যে, কবির দৃষ্টান্তে নিজেও ঐরূপ বাক্য ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ভাবিয়া পান নাই। 'দু'একবার কবির অনুরূপ বাক্য সভাস্থলে প্রয়োগও করিয়াছেন—কিন্তু তাহা মোহকর হয় নাই, হাস্যকর হইয়াছে।

আজ যাঞ্চার পাত্র সম্বন্ধে সুভাষিতটি শুনিয়া দেবভট্ট ভাবিলেন, ভণ্ড কোথাকার! ধার-করা ময়ূরপুচ্ছ গায়ে লাগাইয়া আসিয়াছ, কিন্তু তুমি দাঁড়কাক ছাড়া আর কিছুই নও।

সভা ভঙ্গ হইলে সন্ধ্যার পরে তিনি রাজপুরোহিতের আবাসে গিয়া দেখা দিলেন।

৩

দেবভট্ট যখন রাজপুরোহিতের আবাসে যাইতেছিলেন, কবি যুবক তখন আর্যা শিলাবতীর গৃহাভিমুখে চলিতেছিল। আর্যা শিলাবতী মহাকালমন্দিরের প্রধানা দেবদাসী, নগরের প্রান্তে শিপ্রা নদীর তীরে তাঁহার বাসভবন। সে আপন মনে কত কি ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিল। পথ সঙ্কীর্ণ এবং সর্পিল, তারপরে সর্বত্র সমতল নয়, কাশীর গলিতে মাঝে মাঝে যেমন সোপানাবলী আছে, তেমনি সোপানাবলীহেতু বন্ধুর। কিন্তু এ পথ তাহার বহুদিনের পরিচিত বলিয়া অন্যমনস্কতা তেমন বাধা জন্মাইতে পারে না। অর্ধমনস্ক কবির প্রথম হুঁস হইল মহাকালমন্দিরের গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনিতে। সে চমকিয়া উঠিল—এ কি, ইতোমধ্যে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি? তাহার মনে পড়িল—সেই প্রথম সভার স্মৃতি, যখন সে রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; মনে পড়িল, এখানেই তাহার সঙ্গে আর্যা শিলাবতীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়! সে দিন কীই বা তাহার পরিচয় ছিল, 'ঋতু-সংহার' নামে একটি খণ্ড কবিতামাত্র ছিল, গ্রামে থাকিতেই লেখা, সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। শিলাবতীর রসবোধ আছে বটে—ঐ কবিতাটি শুনিয়াই কবির গৌরবময় ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তারপরে একদিকে শিলাবতীর

সহায়তার দাক্ষিণ্য; আর এক দিকে মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী; সেদিনকার অখ্যাত অজ্ঞাত কবি আজ রাজার সভাসদ্, মহারাজার অনুগৃহীত—শুক্লা তৃতীয়ার চন্দ্রকলা যেমন একটি সুকুমার সোনার বন্ধনী পৃথিবী ও আকাশকে সংযুক্ত করিয়া রাখে, শিলাবতীর সুকরুণ সান্নিধ্য তেমনি কবির অতীত ও বর্ত্তমানকে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

চিন্তায় শিথিলগতি কবি পুনরায় দ্রুত পথ চলিতে লাগিল, কিন্তু মনটাকে অতীতের স্মৃতি হইতে ফিরাইতে পারিল না; কবি ভাবিল, রথ সম্মুখের দিকে চলিলেও পতাকার টান পিছনের দিকেই থাকিয়া যায়।

৪

শিষ্টসম্ভাষণাদির পরে দেবভট্ট ও রাজপুরোহিতের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল—

দেবভট্ট। তারপরে দেখ্‌লেন ব্যাপারখানা।

পুরোহিত। দেখলাম বই কি। এ তো মহারাজার যোগ্য ব্যবহার বটে।

দেবভট্ট। শেষে আপনিও এই কথা বল্‌লেন।

পুরোহিত। কেন, আপনি কি অন্যরূপ মনে করেন নাকি?

দেবভট্ট। করবো না? ঐ অর্বাচীন যুবককে।

পুরোহিত। এ কি বল্‌ছেন! যুবক অল্পবয়স্ক হ'তে পারে, কিন্তু অর্বাচীন কেন?

দেবভট্ট। অর্বাচীন নয়? এক শ বার অর্বাচীন। তারপরে কি দম্ভ?

পুরোহিত। আমি এরূপ পাপমন্ত্রণায় নাই।

দেবভট্ট। পাপমন্ত্রণা? পাপমন্ত্রণা তো অপর পক্ষে। আমি এখনও সেই অহঙ্কারবাণী শুনতে পাচ্ছি—"শৃণুত জনা। অর্বানাৎ ক্রিয়ামিমাং কালিদাসস্ত।" মহাকবি কালিদাসের সৎপ্রবন্ধ মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন।

পুরোহিত। ওঃ, আপনি কালিদাসের কথা বল্‌ছেন? আমি ভেবেছিলাম যুবরাজের কথা।

দেবভট্ট। শান্তম্ পাপম্! যুবরাজের কথা। কি আপদ্!

পুরোহিত। হাঁ, এ বিষয়ে আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি। আপনাকে অবহেলা করে তাকে কাব্য রচনার ভার দেওয়া উচিত হয় নি।

দেবভট্ট। মহারাজ বিস্মৃত হ'য়েছেন যে, পুরাতন তণ্ডুল কীটদষ্ট হ'লেও যথার্থ পণ্য! আমি বলছি, যুবক এবারে একটা অনর্থ ঘটিয়ে বসিবে। ঐ নবাগন্তুক অর্বাচীন দেবতার বিভূতি ও রাজবংশের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জানে কি?

পুরোহিত। এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত।

দেবভট্ট। ওর কবিত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচীন কবিগণের অনুকরণ, আমি পুঁথিপত্র ঘেটে সব প্রমাণ ক'রে দেবো। কেবল ওর নিজস্ব অহঙ্কার আর চাটুবাজী।

পুরোহিত। আপনি এ বিষয়ে একদিন প্রবন্ধ করুন।

দেবভট্ট। করবো কি! লোকটা চাটুবাদের মধু দ্বারা মহারাজা, যুবরাজ ও পাণ্ডিত্যহীন সভাসদ্‌গণকে যেরূপ মুগ্ধ ক'রে রেখেছে।

পুরোহিত। কিন্তু বিক্রমোর্বশী নাটকখানার আপনিও তো প্রশংসা ক'রেছিলেন।

দেবভট্ট। না ক'রে উপায় কি? মহারাজা প্রশংসা করলেন, কাজেই আমাকেও করতে হ'ল।

পুরোহিত। কিন্তু নাটকখানায় কবির প্রতিভাই প্রকাশ পেয়েছে।

দেবভট্ট। প্রকাশ পেয়েছে ওর চাটুবাদের কৌশল আর গ্রাম্যতাজাত দম্ভ! মহারাজার বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ উপলক্ষ্যটাকে সূত্র ক'রে নাটকের নাম ছিল বিক্রমোর্বশী! ব্যঞ্জনা দ্বারা বুঝিয়ে দিল যে, মহারাজাই বিক্রম আর উর্বশী হচ্ছে যে পৃথিবীজাত কন্যা, অর্থাৎ কি না মহারাজা বিক্রমের দ্বারা সসাগরা পৃথিবীকে জয় করলেন। আর অমনি মহারাজকে চন্দ্রবংশোদ্ভূত বলে বর্ণনা করাও হ'ল। কি চাটুবাদ!

পুরোহিত। আমার কিন্তু এত মনে হয়নি।

দেবভট্ট। আপনার সরল মন। যার মনে হ'বার ঠিক হ'য়েছে, তারপর থেকেই লোকটার প্রতি মহারাজার প্রসাদ শতগুণে বেড়ে গিয়েছে।

পুরোহিত। সে কথা সত্য বটে।

দেবভট্ট। আমি বলে রাখছি, এই নূতন কাব্য প্রণয়ন উপলক্ষ্যে এমন নূতনতর, মধুরতর চাটুবাদ বর্ষণ করবে যে, মহারাজা আর যুবরাজ দু'জনেই অধিকতর বশীভূত হয়ে পড়বে।

পুরোহিত। তা হ'লে বল্‌তে হবে, লোকটার শক্তি আছে।

দেবভট্ট। শক্তি না শক্তু! মাথা আর মুণ্ডু! ওর পিছনে রয়েছে সেই ডাকিনীর ছায়া।

পুরোহিত। ডাকিনী? কে?

দেবভট্ট। শিলাবতী।

পুরোহিত। এ কি অনার্য উক্তি! আর্যা শিলাবতী মহাকালের প্রধানা দেবদাসী।

দেবভট্ট। দেবদাসী! বলুন দৈত্যদাসী! ডাকিনী, নাগিনী, পাপিনী, তাপিনী! রাজসভা ও রাজদেবালয়ের মধ্যে আপনার গতিবিধি। নগরের লোক ওদের নিয়ে কি বলাবলি করে, তা আপনি জানেন না!

পুরোহিত। জনশ্রুতিতে কর্ণপাত অবিধেয়!

দেবভট্ট। জনশ্রুতি! ও লোকটা প্রথমে এসে শিলাবতীর গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল।

পুরোহিত। এরূপ শুনেছি বটে!

দেবভট্ট। তারপরে শিলাবতীর অনুগ্রহেই প্রধানামাত্যের প্রসাদ লাভ করে লোকটা!

পুরোহিত। তাও শুনেছি! কিন্তু তর্ক এই যে, সবাই কেন ওকে প্রসাদ দিতে উদ্যত।

দেবভট্ট। উদ্যত হবে না? প্রধানামাত্যের প্রধানা উপপত্নী মালব দেশের মেয়ে।

পুরোহিত। তা হবে!

দেবভট্ট। আর কালিদাসের প্রথম নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র।

পুরোহিত। সে নাটকের অভিনয়ে আমি উপস্থিত ছিলাম।

দেবভট্ট। আপনি তো কেবল নাটকই দেখেছেন।

পুরোহিত। আর কি দেখবার থাক্‌তে পারে?

দেবভট্ট। ঐ তো বললাম, প্রধানামাত্যের প্রধানা উপপত্নী মালবকন্যা আর নাটকখানির নাম মালবিকাগ্নিমিত্র! এবার যোগাযোগ ক'রে নিন।

পুরোহিত। ওঃ, বুঝেছি! প্রকারান্তরে তাকেই মালবিকা বলা হ'ল।

দেবভট্ট। আরও প্রকারান্তরে প্রধানামাত্যকে অগ্নিমিত্র বলা হল।

পুরোহিত। অহো, কি বুদ্ধি!

দেবভট্ট। একেই বলে পাপবুদ্ধি। তারপরে প্রধানামাত্য খুশী হয়ে মহারাজার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলেন। নিছক চাটুবাদের সোপানে লোকটা উঠছে—আরও উঠবে। দেখুন না, এবার কি ক'রে বসে! হয় তো মহারাজকে এবার স্বয়ং মহাদেব বা ইন্দ্র বলে বসবে।

পুরোহিত। আপনার প্রতি অবিচার হয়েছে সন্দেহ নেই। শুনুন পণ্ডিত-প্রবর, আমি বরঞ্চ এক কাজ করি। আমি যুবকের আবাসে গিয়ে বোঝাই যে, এ ভার তার পক্ষে গ্রহণ করা অকর্তব্য। সে ছেড়ে দিলে, এ ভার আপনার উপরে আপনি এসে পড়বে।

দেবভট্ট। আপনি ধার্মিক পুরুষ আর সরলচিত্ত ব্যক্তি, এ সঙ্কল্প আপনার মতোই হয়েছে। কিন্তু পাষাণে নাস্তি কর্দমঃ—পাষণ্ড ও-সব শুনবে না। তা'ছাড়া, আপনি কি তাকে আবাসে গিয়ে পাবেন?

পুরোহিত। এত রাত্রে আর কোথায় যাবে?

দেবভট্ট। অনেক স্থান আছে, সেখানে যাওয়ার পক্ষে রাত্রিই প্রশস্ত সময়।

পুরোহিত। কোথায়?

দেবভট্ট। কোথায়? তবে শুনুন, আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি, এখন সে শিলাবতীর কুঞ্জে।

পুরোহিত। কাব্যরসচর্চা হচ্ছে নিশ্চয়।

দেবভট্ট। নবরসের মধ্যে যে-কোন একটা রসের চর্চা যে হচ্ছে, তা নিশ্চয়।

ঠিক সেই সময়ে আর্যা শিলাবতী ও কালিদাসের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইতেছিল—

শিলাবতী। কবি, আমি জানি, আচার্য দেবভট্ট তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নয়, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? মহারাজা উপলক্ষ্য মাত্র, তোমার জন্মমুহূর্তে স্বয়ং দেবী সরস্বতী এ ভার তোমাকে দিয়েছেন। কাজেই তোমার দ্বিধা করা অনুচিত।

কালিদাস। আর্যে, আমার কাছে তুমিই মূর্তিমতী বাণী।

শিলাবতী। আমিও উপলক্ষ্য। সুর বীণাকে আশ্রয় ক'রেই জাগে, তবু বীণাযন্ত্র উপলক্ষ্যের অধিক নয়। যে গান বীণাকে অতিক্রম ক'রে না যায়, সে তো গানই নয়। তোমার কাব্যও উপলক্ষ্যকে অতিক্রম ক'রে যাবে! যখন তা' সম্পূর্ণ হবে, দেখতে পাবে—কোথায় উজ্জয়িনী, কোথায় উজ্জয়িনীর মহারাজা, আর কোথায়ই বা হূণযুদ্ধবিজয়ী যুবরাজ! সকলকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে সত্যতর হ'য়ে উঠেছে তোমার কাব্য, উপলক্ষ্যের মূল সূত্র ঢাকা পড়ে গিয়েছে তার বিকশিত দলগুলির অন্তরালে, যেমন ঢাকা দিয়েছে তোমার গলার মালার ফুলগুলিতে মালার সূত্রটি।

কালিদাস। এ মালাও যে তোমারি দান।

শিলাবতী। কিন্তু মালাও যে উপলক্ষ্য।

কালিদাস। এ কথা বার বার কেন বলছ? আজ আমি যা, তার মূলে যে তুমি।

শিলাবতী। আমার সেই প্রেরণার মূলে রয়েছে তোমার প্রতিভা। আমার সহচরী নিপুণিকা সন্ধ্যাবেলায় ঐ যূথীর মালাটি গেঁথেছিল, কিন্তু ওখানে থাকলে তো চলবে না, যাও সিপ্রাতীরের যূথীবনে, সেখানে ফুলের প্রাচুর্য তো নিপুণিকার সৃষ্টি নয়।

কালিদাস। আমার অতদূর গিয়ে কাজ নেই।

শিলাবতী। এ কবির মতো উক্তি নয়।

কালিদাস। কেন ?

শিলাবতী। যূথীবন যেমন ফুল না ফুটিয়ে পারে নি, তোমারও কাব্য না লিখে উপায় নেই।

কালিদাস। তাতে যদি লোকে অপ্রসন্ন হয়।

শিলাবতী। সিপ্রাতীরে এমন কীট থাকা অসম্ভব নয়, যার কাছে যূথীর সুগন্ধ মধুর নয়, তাতে কি আসে যায় ?

কালিদাস। আসল কথা কি জানো ? এসব যুদ্ধ কলহ দ্বন্দ্ব আমার ভালো লাগে না—আমার ইচ্ছা করে, তোমাকে অবলম্বন ক'রে একটি পরিপূর্ণ কাব্য রচনা করি।

শিলাবতী। সে কাব্য রচিত হ'লে দেখবে, তা আমাকে অতিক্রম ক'রে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

কালিদাস। তার কারণ, তোমার বাস্তব সত্যকে অতিক্রম ক'রে বিরাজ করছে তোমার পরম সত্য, ফুলকে অতিক্রম ক'রে যেমন বিরাজ করে তার গন্ধের পরিমণ্ডল।

শিলাবতী। সত্য কথাই বলেছ। তেমনি মানব বনের সংসারের একটি বৃহত্তর কাজেই সত্যতর রূপ বিরাজ করছে এই যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষুদ্র রূপের উর্ধ্বে।

কালিদাস। পড়ে মরুকগে যুদ্ধবিগ্রহ আর তার ক্ষুদ্র রূপ বৃহৎ রূপ ! শিলাবতি, তুমি সুন্দর, তুমি অপরূপ সুন্দর।

শিলাবতী। এখানেও আমি উপলক্ষ্য। তোমার মনে সৌন্দর্যের যে আদর্শ নীহারিকারূপে ঘূর্ণ্যমান, আমাকে অবলম্বন ক'রে তা একটা রূপ পাবার চেষ্টা করছে।

কালিদাস। লোকে ভাবে, আমি চাটুবাক্যের দ্বারা উন্নতির পথ প্রশস্ত করছি। তারা বলে যে, মালবিকাগ্নিমিত্রে মহামাত্যের স্তুতি করেছি, বিক্রমোর্বশীতে মহারাজার স্তুতি করেছি—সব মিথ্যা, মিথ্যা। তারা যদি সত্যিই জানতো আমি কার স্তুতি করছি……

শিলাবতী। কার স্তুতি করছো।

কালিদাস। মালবিকা যার ছায়া, উর্বশী যার ছায়া, সেই নারীর।

শিলাবতী। কে সেই সৌভাগ্যবতী?

কালিদাস। তুমিও জানো না? কেন ছলনা করছো—তুমি! তুমি! তুমি!

শিলাবতী। অবশ্যই জানতাম, কিন্তু ছলনায় যে তুমিই পড়েছো।

কালিদাস। কেন?

শিলাবতী। মালবিকা আর উর্বশী আর এই শিলাবতী, তিনজনেই সেই নারীর ছায়া।

কালিদাস। কোথায় সে?

শিলাবতী। তোমার কল্পনায়।

কালিদাস। কি তার নাম?

শিলাবতী। সৌন্দর্যলক্ষ্মী—অন্য যে-কোনও নাম দিতে পারো—তাতে কিছু আসে যায় না।

কালিদাস। শিলাবতি, তুমি পাষাণী।

শিলাবতী। তুমি আগেই তো একবার বলেছ সুন্দর।

কালিদাস। ও দুই কি তবে এক।

শিলাবতী। নয় কেন? আমাদের মহাকালমন্দিরের উত্তর দিকে সেই যক্ষিণীমূর্তিটি দেখনি?

কালিদাস। সুন্দর বটে।

শিলাবতী। ও সৌন্দর্য কি পাথরে ছাড়া আর কিছুতে ফুটতে পারতো!

কালিদাস। কেন, রতির আশ্রয় কি মদন নয়?

শিলাবতী। রতি যে মুগ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীক, তাই তার আশ্রয় মদন। তাঁর সঙ্গে তুলনা করো পার্বতীর, সে যে অপরূপ, সে যে তুলনারহিত, তাই সে অবলম্বন করেছে মহাদেবীকে! মহৎ সৌন্দর্যের মহৎ অবলম্বন। কবি, শুনেছি তোমার ঋতুসংহার কাব্য, মুগ্ধ সৌন্দর্যের সুনিপুণ আলিম্পন। দেখেছি

তোমার মালবিকা আর বিক্রমোর্বশী, এ দু'টি জ্যোৎস্না রাত্রির কুমুদ কহ্লার! কিন্তু তোমার কাছে যে আমার প্রত্যাশার অবধি নেই! ওতে আমি সন্তুষ্ট হব না। এবারে যাও, করো মহৎ সৌন্দর্যের জয়ধ্বনি, পূর্ণ বিকশিত হোক সেই শতদল প্রচণ্ড সূর্যের তাপকে অঙ্গের বিভূতি ক'রে! কবি, এবারে গাও হর-পার্বতীর মিলনবার্তা, পুড়ে মরুক তোমার মুগ্ধ মদন মহৎ সৌন্দর্যের আত্মদানের হোমপূতাগ্নিশিখায়।

কালিদাস। এ কি মানুষে সম্ভব?

শিলাবতী। মহামানুষে সম্ভব।

কালিদাস। মহামানুষ কে?

শিলাবতী। মহাকবি! আমি তো তোমার প্রতিভার অন্ত দেখি না, পূর্বাপর-সাগরবিস্তৃত হিমালয়ের ন্যায় তোমার প্রতিভা পৃথিবীর মানদণ্ড—তার অসম্ভব কিছু দেখি না।

কালিদাস। শিলাবতি, তোমাতে সবই গুণ, কেবল একটিমাত্র দোষ।

শিলাবতী। গুণ তো বুঝলাম, দোষ কি শুনি।

কালিদাস। আমার প্রতিভার প্রতি অহৈতুক আস্থা।

শিলাবতী। এ ছাড়া আর কিছু নয় তো! তা, চাঁদের অনেক গুণের মধ্যে একটি মাত্র দোষের মতো চোখে পড়বে না।

কালিদাস। তোমার উক্তিগুলি মুক্তাফল, সংগ্রহ ক'রে রাখলে বাণীর অলঙ্কার হবে।

শিলাবতী। রাখো, রাখো, তুমি পাকা জহুরী।

কালিদাস। এবারে উঠি, অনেক রাত্রি হল।

শিলাবতী। মনে পড়েছে?

কালিদাস। তোমার কাছে এলে সব ভুলে যাই।

শিলাবতী। কিন্তু তারা ভোলে না, যারা অনেক রাত্রে তোমাকে ফিরে যেতে দেখে আমার কুটীর থেকে।

কালিদাস। তারা একেবারেই অভাজন। হৃদয়কে নাড়া দিতে পারে

অনেক রমণী, কিন্তু যার আবেগ কল্পনা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়, তাকে নাড়া দেয় —এমন নারী দুর্লভ !

শিলাবতী। এবারে সেই দুর্লভই হোক তোমার কাব্যের বিষয় !

কালিদাস। তারই তো সাধনা করলাম এতক্ষণ, এতদিন।

শিলাবতী। এতদিন সে ছিল কবির বিষয়, এবারে হোক কাব্যের বিষয়। দু'য়ে অনেক প্রভেদ।

কালিদাস। শিলাবতী জানো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

শিলাবতী। আমি তো জানিই—এমন কি, পাড়ার লোকেরও জানতে বাকি নেই।

কালিদাস। মানে, তারা ত কিছু জানে না ! তারা কি জানে যে, জোয়ারের কাদাজলের মধ্যেই পারদ থাকে—যে চাঁদ তাকে আগিয়ে দেয়, তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

শিলাবতী। কেমন ক'রে জানবে ? সংসারে সবাই তো কবি নয়। তারা শাদা চোখে দেখে, মধ্যরাত্রে এক যুবক নিঃসঙ্গ এক রমণীর ঘর থেকে বেরোচ্ছে। এই কি যথেষ্ট নয় ?

কালিদাস। নিন্দার পথ আর প্রশস্ত হবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।

শিলাবতী। আগামী রাত্রি পর্যন্ত, কি বলো ?

কালিদাস। নেহাৎ মিথ্যা বলোনি, যাই আজ, আর সুযোগ দেওয়া নয়—অতএব চললাম।

শিলাবতী। পথ নির্বিঘ্ন হোক।

কালিদাস। তোমার সুপ্তির মতো !

৫

শিলাবতীর কুটীর নগরের একান্তে অবস্থিত। তার পরে একখানি মাঠ। মাঠের পরেই নদীতীরে মহাকালের মন্দির, সেখান হইতেই রীতিমত নগরের আরম্ভ। কালিদাস কুটীর ছাড়িয়া মাঠের মাঝে পড়িল। যূথী-পরিমলের সহিত

মিশিয়া কেতকীর আর্দ্র সুগন্ধ বাতাসে একখানি চন্দ্রাতপ বুনিয়া দিয়াছে। রাত্রি গভীর। কৃষ্ণা দশমীর চাঁদ অর্ধবিকশিত কহ্লারের মতো আকাশে ভাসিতেছে, তাহার কিরণ এমন সতেজ নহে যে, নিদ্রিত পাখীর স্বপ্নভঙ্গ করিয়া অকালকূজন জাগাইয়া দেয়। নির্জন পথ ধরিয়া কবি আপন মনে চলিতেছে, মহাকালের মন্দিরের নিকটে আসিয়া তাহার চৈতন্য হইল। সেই অন্ধকারে ঘনতর অন্ধকারের মতো কালো পাথরে গড়া মন্দিরটি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান। কবি কি ভাবিয়া তাহার অলিন্দে একটি স্তম্ভের নিকট বসিল। তাহার নিভৃত চিত্তে, গিরিগুহায় প্রতিধ্বনির মতো শিলাবতীর বাক্যগুলি ঘুরিয়া মরিতেছে। কতক্ষণ সে এভাবে বসিয়াছিল জানি না—যখন তাহার সম্বিৎ হইল, উত্তর দিকের আকাশে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। এক দিগন্ত হইতে অন্য দিগন্ত অবধি মেঘমালা প্রসারিত, স্তরে স্তরে মেঘ, মেঘের উপরে মেঘ, কবির মনে হইল, দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় যেন আপন রহস্যময় বিশাল পটসন্ধানী কবির চোখের সম্মুখে মেলিয়া দিয়াছে। মেঘান্তরালে দশমীর চন্দ্রের অধিকাংশ লুপ্ত, যেটুকু দৃশ্যমান, তাহাতে রহস্য লঘুতর না হইয়া আরও ঘন হইয়া উঠিয়াছে। জলদজালের কোথাও কোথাও চন্দ্রালোক পড়িয়া গৈরিকোজ্জ্বল গিরিগাত্রের মতো প্রতিভাত; কোথাও ঘনান্ধকার গিরিগুহার মতো হাস্যময়, মেঘগাত্রে ছোট ছোট বিদ্যুৎ-শিখা গিরিগাত্রে সঞ্চরণশীল কিন্নররমণীগণের মতো চঞ্চলা; মাঝে মাঝে চাপা মেঘের ধ্বনি গিরিকন্দরে বিবর্ধিতশব্দ কুঞ্জরবিজয়ী সিংহগর্জনের মতো গম্ভীর; আবার সব নিস্তব্ধ! এই মেঘমালা দর্শনে কবির কল্পনায় নগাধিরাজের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়া গেল আর জোয়ারের সূত্রপাতে যেমন এক প্রকার স্বতঃস্ফূর্ত অস্ফুট কল্লোল জাগে—তেমনি করিয়া মনে জাগিল,

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

চকিত কবি বুঝিল যে, কবির প্রতি সদয় মহাকাল অনাগত কাব্যের বাণীময় প্রথম ইঙ্গিতটি দান করিয়াছেন। আর বিলম্ব না করিয়া মহাকালের উদ্দেশ্যে একটি প্রণতি নিবেদন করিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

কালিদাস নূতন কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়াছে। প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে নূতন রচিত সর্গটি শিলাবতীকে সে শুনাইয়া যায় আর তার পরিবর্তে শিলাবতীর প্রসন্ন হাসি ও কণ্ঠের মালা লাভ করে।

ওদিকে নগরে আসন্ন উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। উজ্জয়িনী সুবৃহৎ নগর, তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ নগর, কিন্তু হইলে কি হয়, এত লোকসমাগম হইবে যে, কুলাইবার কথা নয়। তাই নগরের বাহিরে শিবির-সন্নিবেশ চলিতেছে। উজ্জয়িনীর এক দিকে সিপ্রা নদী, তিন দিক্ প্রাচীরে বেষ্টিত, মাঝে মাঝে বিরাট্ সব সিংহদ্বার। প্রাচীরের বাহিরে কতক দূর পর্যন্ত উচ্চ প্রান্তর, তারপরে শস্যক্ষেত্র। ঐ মাঠের মধ্যে সারি সারি শত শত শিবির পড়িতেছে, অসমতল স্থান কাটিয়া সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চকমিলান আকারে শিবিরসন্নিবেশ হইতেছে—এক একটি চকে মাঝে ফুলের বাগান রচিত হইয়াছে, ফুলের বাগানের মাঝে ফাঁক, লোক বেড়াইতে পারিবে। মাঠের একদিকে বিপণি-শ্রেণী বসিয়াছে, দূরদূরান্ত হইতে ব্যবসায়ী, বণিক্ আসিয়াছে, আনিয়াছে—মনোহর সব শিল্পজাত দ্রব্যাদি। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা, গুর্জর হইতে মগধ, বঙ্গ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ সকল দেশের নৃপতিগণ, পণ্ডিতগণ, ব্যবসায়িগণ আসিবে, অনেকে ইতোমধ্যেই আসিয়া পৌছিয়াছে। কেহ অশ্বে আসিয়াছেন, কেহ উষ্ট্রে, কেহ হস্তীতে, কাজের লোকেরা গো-যানে। এই সব ভারবাহী শত সহস্র পশুর খাদ্য যোগানো দায়, সুযোগ পাইলেই তাহারা শস্যক্ষেত্রে গিয়া পড়ে, তখন কৃষকে আর পশুর মালিকে কলহ বাধিয়া যায়। সমগ্র ভারতবর্ষের যাহা কিছু রম্য, যাহা কিছু কাম্য, সবই আজ উজ্জয়িনীর প্রান্তে সমবেত।

একদিকে স্বাধীন নৃপতিগণের শিবির, একদিকে মিত্র-নৃপতিগণের শিবির। প্রত্যেক নৃপতির সঙ্গে তাঁহার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীর, শ্রেষ্ঠ কবি ও পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ সব ব্যবসায়ী আসিয়াছে; একের সহিত অপরের ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতা পড়িয়া গিয়াছে—কেহ হার মানিতে রাজি নয়।

নগরের মধ্যেও জনতা অল্প নয়। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আসিয়া ভীড় করিয়াছে, কাহারো গৃহে আর তিলধারণের স্থান অবশিষ্ট নাই। পথে চলা দায়। অল্পদিনের মধ্যে সরোবর যেন কূল ছাপাইয়া গিয়াছে—এমনি থমথমে থই থই ভাব।

রাজপ্রাসাদে আয়োজনের ও আড়ম্বরের বর্ণনা সম্ভব নয়।

কালিদাস যে দিন নূতন কাব্যের শেষ আর্যাটি শিলাবতীকে শোনাইল, শিলাবতী গলার মুক্তার হার খুলিয়া কবিকণ্ঠে অর্পণ করিল। কালিদাস বলিল—আজ পুষ্পহারের বদলে মুক্তাহার কেন!

শিলাবতী। পুষ্পহার যে প্রতি দিন গাঁথ্‌তে হয়, প্রতি দিন ফেলে দিতে হয়। সে তোমার মধুর আলাপের মতো সুন্দর বটে, কিন্তু ধরে রাখবার উপায় নেই। তোমার অমর কাব্যের যোগ্য প্রতিদান এই মুক্তাহার।

কালিদাস। এবারে বলো—কেমন লাগলো?

শিলাবতী। ভাষা অক্ষম বলেই সে কথা বলবার ভার ঐ মুক্তামালার উপরে দিয়েছি।

কালিদাস। এ কি সামাজিকগণের রুচিকর হবে?

শিলাবতী। সমাজ তো ঐ রাজসভার মধ্যে আবদ্ধ নয়, দূরদেশে ও দূর কালে তা' ছড়িয়ে রয়েছে।

কালিদাস। আমার আগের রচনার তুলনায় কেমন লাগলো?

শিলাবতী। আগের রচনায় ছিল তোমার কল্পনার লীলা, এবার তোমার কল্পনা-সৃষ্টি কাব্যে নেমেছে।

কালিদাস। মহারাজ কি খুশী হবেন?

শিলাবতী। মহারাজ তো দিঙ্‌নাগাচার্য নন। বেশি কি বলবো—এ কথা শুনলে স্বয়ং হরপার্বতী তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

তারপরে শিলাবতী বলিল—কবি, তোমার পুঁথিখানা রেখে যাও, রাত্রে আর একবার পড়বো। কাল সন্ধ্যায় এসে আবার নিয়ে যেও। পরশু তো তোমার রাজসভায় পড়বার কথা।

কালিদাস পুঁথিখানা রাখিয়া বিদায় লইল।

পরদিন সন্ধ্যায় কালিদাস শিলাবতীর ভবনে পৌছিলে শিলাবতী বলিল, আমার সঙ্গে এসো।

ছ'জনে একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। সেখানে একটি ক্ষুদ্রায়ত শ্বেতপাথরের জলচৌকির উপরে পুঁথিখানি রক্ষিত, আর পুঁথিখানির উপরে একটি সুকুমার ময়ূরপুচ্ছ রহিয়াছে কালিদাস দেখিতে পাইল।

সে শুধাইল—ব্যাপার কি? ময়ূরপুচ্ছ রাখলে কেন?

—আমি রাখিনি।

—তবে রাখ্‌লে কে?

—তা হ'লে শোনো।

—কাল অনেক রাত্রি জেগে পুঁথিখানা আবার শেষ করলাম। তারপরে কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। স্বপ্ন দেখলাম, স্বয়ং কুমারজননী উমা আবির্ভূত হয়েছেন, হ'য়ে বলছেন যে, কবির কাব্য শুনে আমি খুশী হ'য়েছি—আরও খুশী হ'য়েছি যে, কবি আর অধিক দূর অগ্রসর না হ'য়ে আমাকে লজ্জা থেকে রক্ষা করেছে। তারপরে 'এই নাও' ব'লে কর্ণালঙ্কার থেকে একটি শিখণ্ডি বই খুলে আমার হাতে দিলেন, বললেন যে, কবিকে আমার নাম ক'রে দিও।

—স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠ্‌লাম, ভাবলাম, নিশ্চয়ই বইটি পাবো। কিন্তু স্বপ্নমাত্র মনে হ'ল, হাসি পেলো, ভাবলাম—যাক্, স্বপ্ন বৃথা, কাল তোমাকে বলা যাবে—সে মন্দ মজা হবে না।

আজ সকালে উঠে পুঁথিখানার কাছে গিয়ে দেখি—এ কি! পুঁথির উপরে এ শিখিপুচ্ছ এলো কোথা থেকে? তবে কি কুমারজননীর আশীর্বাদ স্বপ্ন মাত্র নয়!

আর বলিবার প্রয়োজন হইল না—আর বলিবার ছিলই বা কি!

ছুটি বিস্মিত নরনারী হতবুদ্ধি হইয়া রোমাঞ্চিত দেহে আকাশের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অন্ধকার আকাশে তখন স্তরে স্তরে মেঘ দিব্য শিখিকলাপের মতো বিস্তারিত হইয়া গিয়াছে, তাহার নখরে বিধৃত পিষ্ট বিদ্যুৎ-

ক্লিষ্ট সর্পের মতো চেষ্টা করিতেছে, মেঘমৃদঙ্গের গম্ভীর ধ্বনির তালে তালে মেঘকলাপ নড়িতেছে, আর অর্ধান্তরিত শুক্লা শশীর স্তিমিত আলোতে কুমার-জননীর স্নেহের স্মিতকৌতুক যেন কিছুতেই বাধা মানিতেছে না। দুইজনে মুগ্ধের মতো এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কতক্ষণ দেখিল জানি না, অবশেষে শিলাবতী বলিল—দেখ্‌লে ?

কালিদাস বলিল—দেখলাম।

শিলাবতী আবার বলিল—আবির্ভূত হ'য়ে আশীর্বাদ ক'রে গেলেন।

কালিদাস উঠিয়া পড়িল, বলিল—আর ভয় নাই।

৭

আজ উৎসবের দিন। সূর্যোদয়ের শুভ মুহূর্তে মহারাজা, যুবরাজ, কুলগুরু, রাজপুরোহিত ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ পদব্রজে মহাকালমন্দিরে গিয়া পূজা দিয়া আসিয়াছেন। ইহাই উৎসবের কার্যসূচীর প্রথম অঙ্গ।

তারপরে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজসভার অধিবেশন বসিয়াছে। মহারাজা স্বয়ং অভ্যাগত নৃপতি ও পণ্ডিতবর্গকে স্বাগত জানাইয়াছেন, তাঁহারাও সময়োচিত উত্তর দিয়াছেন। তৎপর মহারাজা হূণসমরবিজয়ী কুমারগুপ্তকে 'হূণারি' উপাধি দানের প্রস্তাব করিলে সমগ্র সভা একবাক্যে 'সাধু সাধু' ধ্বনির দ্বারা মহারাজার প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়াছেন। প্রাহ্ণের অধিবেশন এখানেই সমাপ্ত। তারপর সারাদিন ধরিয়া নৃত্য গীত, কৌতুক প্রদর্শন চলিয়াছে, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' চলিয়াছে—মহারাজা অন্যান্য নৃপতিগণ সহ নগর পরিদর্শনে বাহির হইয়া, দর্শন দিয়া এবং দর্শন করিয়া উৎসবের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

এখন সন্ধ্যাবেলা। পুনরায় রাজসভার অধিবেশন বসিয়াছে। এবারে রাজকবি সদ্যপ্রণীত কাব্য পাঠ করিবেন—সান্ধ্য অধিবেশনের ইহাই প্রধান অঙ্গ।

রাজসভার মধ্যস্থলে সিংহাসনোপরি মহারাজা উপবিষ্ট, তাঁহার বামে যুবরাজ কুমারগুপ্ত, দক্ষিণে শুভ্রকেশ, শুভ্রবেশ কুলগুরু; আরও বামে স্বাধীন ও মিত্র

নৃপতিগণ, আরও দক্ষিণে ভারতের যাবতীয় কবি ও পণ্ডিতগণ। পণ্ডিতগণের মধ্যে, তারাগণের মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় আলঙ্কারিকশ্রেষ্ঠ দিঙ্‌নাগাচার্য উপবিষ্ট; তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু শরীর এখনো ঋজু ও সবল, চোয়াল ভারি, মস্তক প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড একটা হাতুড়ির ন্যায়, ঐ হাতুড়ির আঘাতে কত কবিযশঃপ্রার্থীর যশঃস্তম্ভকে ভূগর্ভে সমূলে তলাইয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই, স্বয়ং সরস্বতী তাঁহাকে ভয় করিয়া চলেন; তাঁহার মস্তকের চারি দিক্ ক্ষুর দিয়া কামানো, মাঝখানে একগুচ্ছ দীর্ঘ কেশ, দিঙ্‌নাগাচার্য দুর্ধর্ষ দ্রাবিড়ী পণ্ডিত। তাঁহার পাশে বসিয়া আছেন রাজসভার প্রাচীন কবি দেবভট্ট।

সিংহাসনের সম্মুখে অদূরে, সিংহাসনের দিকে মুখ করিয়া শ্বেত প্রস্তরের আসনে কালিদাস উপবিষ্ট; তাঁহার কণ্ঠে শ্বেত উত্তরী ও শ্বেতপদ্মের মালা, কুঞ্চিত কেশদামে একটি আকন্দ ফুলের মালা জড়িত, সম্মুখে তাঁহার ভূর্জপত্রের পুঁথি, সদ্যপ্রণীত কাব্য। কবির পাশে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু নিচুল। দু'জনে সমবয়সী, দু'জনেই কবি; কবিত্বে নিচুল কালিদাসের সমকক্ষ নয়, কিন্তু কাব্য-রসাস্বাদে, সরসতায় বড় ন্যূন নহে, কবি শ্লেষ করিয়া বলিয়া থাকেন 'সরস নিচুল', নিচুল মানে একপ্রকার বেতগাছ। কালিদাস সখাকে বলেন—তোমরা দু'জনেই সমান সরস! নিচুল কালিদাসের গ্রামের লোক, সেখানেই থাকেন, এই উপলক্ষ্যে আসিয়াছেন।

কালিদাসের পিছনে সভাসদ্, সামাজিক ও নাগরিকগণ, আর দ্বিতলের চক-মিলানো অলিন্দে জালায়তনের অন্তরালে পুরস্ত্রীগণ। উপর হইতে রাজসভার মধ্যে অবতরণের জন্য শ্রেণীবদ্ধ মর্মরসোপান—ভিতরে গতায়াত-সোপানও আছে।

সভাস্থল পুষ্পগন্ধে, ধূপ ও অগুরুর সৌরভে আমোদিত। শত শত দীপের প্রভাবে আলোকিত, সমস্ত সভা নিস্তব্ধ, তবু জনপূর্ণ বলিয়া থম্‌থম্ করিতেছে। এমন সময়ে সময়সূচী শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, মহারাজার ইঙ্গিতে কুলগুরু উঠিয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন—এবং তারপরে সভাস্থ সকলের অনুমতি লইয়া মহারাজা কবিকে কাব্য পাঠ করিতে অনুরোধ জানাইলেন।

কবি উদ্দেশ্যে মহাকালকে প্রণাম করিলেন, মহারাজকে নমস্কার করিলেন, সভাকে নমস্কার করিলেন, এবং একবার উর্ধ্বে জালায়তনের দিকে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুঁথির গ্রন্থি উন্মোচন করিলেন। কবিকে যেন কিঞ্চিৎ দ্বিধা-যুক্ত বলিয়া মনে হয়—নিচুল কাণে কাণে বলিল—ভয় নাই, প্রথম রসিকসম্ভাষণে কবিতা ও বনিতা ভীত হ'য়েই থাকে।

কালিদাস অস্ফুটস্বরে বলিল—সবাই কি রসিক, দিঙ্নাগের ভাবখানা দেখো না।

—বেশি শুঁড় নড়িলে বেতের কাঁটা ফুটবে! তুমি নির্ভয়ে সুরু করো। কবি নতমস্তকে কাব্যের নাম ঘোষণা করিল—

—'কুমারসম্ভবম্ মহাকাব্যম্।'

তারপরেই আবৃত্তি সুরু করিল—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

কবির কণ্ঠস্বরে একটি মোহিনী শক্তি ছিল! সে যেন শব্দের ইন্দ্রধনু, তার মধ্যে সাতটি সুর এমন অঙ্গাঙ্গী মিশ্রিত যে, একটি হইতে আরটিকে স্বতন্ত্র ধারণা করা যায় না—অথচ একই সঙ্গে সাতটির স্বাদ পাওয়া যায়, সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রামের উপরে, মনের উপরে একটি রঙের আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া দেয়। সেই স্বরে সেই সুরে একটির পরে একটি শ্লোক ধ্বনিত হইয়া চলিল। হিমালয়ের বর্ণনায় উদাত্ত অনুদাত্ত শ্লোকমালা শব্দের হিমালয় সৃষ্টি করিরা দিল। তারপরে উমার জন্মবৃত্তান্ত ও বাল্যলীলা কথিত হইল। দৈত্যভয়ে ভীত দেবতাগণ ব্রহ্মাসমীপে উপস্থিত হইলেন, স্বাধিকারপ্রমত্ত মদন দগ্ধ হইল। রতিবিলাপের শ্লোকগুলি আকুলমূর্দ্ধজা রতির ন্যায় নিস্তব্ধ সভাকক্ষে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, তারপরে তপঃফলোদয়, উমাপ্রদান এবং সপ্তম স্বর্গে উমাপরিণয়ে বিশ্বব্যাপী আনন্দোৎসব ধ্বনিত হইয়া উঠিল—দৈত্যকবলমুক্তির আসন্ন আশায় ব্রহ্মাণ্ডের

পূর্বাশা নবরাগ ধারণ করিল। চরাচরের উল্লাসসঙ্গীতের সনে আসিয়া কবির কুমার-সম্ভবম্ মহাকাব্যের সমাপ্তি ঘটিল। কবি থামিলেও প্রতিধ্বনি থামিল না, সভার আনাচে কানাচে, স্তম্ভশ্রেণীতে, অলিন্দে, বলভিতে প্রতিধ্বনি থম-থম করিতে লাগিল এবং অবশেষে প্রতিধ্বনি থামিলেও শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরে, আকাশে ঝড় থামিয়া গেলেও পর্বতগুহায় যেমন তাহার প্রতিশব্দের লীলা চলিতে থাকে, তেমনি কাব্যের স্মৃতি বার বার আবর্তিত হইতে লাগিল। মহৎ কাব্যের ধর্মই এই যে, কাব্যপাঠ শেষ না হইয়া গেলে তাহার মহত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না। কবি বীজ বপন করে, রসিক চিত্ত তাহাকে রসবোধের দ্বারা লালন করিয়া বনস্পতিতে পরিণত করে। যে কাব্য শেষ হইলে মনেই হয় না যে, এখনো শেষ হয় নাই—তাহা কাব্যই নয়।

কবি শেষ করিল, কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দ তখনো স্থাণুবৎ। প্রথমে মহারাজার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন, এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল! সেই বাক্যে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া সমস্ত সভা এককণ্ঠে সাধুবাদ ধ্বনিত করিল।

তখন মহারাজা নিজ কণ্ঠের মণিমালা কবিকে অর্পণ করিতে উদ্যত হইলে দিঙ্‌নাগাচার্য বলিল—মহারাজ, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। কাব্য সমাপ্ত হইল বটে, কিন্তু এখনো তাহার বিচার বাকি। বিচারান্তে পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইলে তখন কবিকে পুরস্কৃত করিবেন—কেহ আপত্তি করিবে না।

যুবরাজ বলিলেন, সভাস্থ রসিকবর্গের সম্মতি মৌনেই কি বিচার সম্পন্ন হয় নাই?

দিঙ্‌নাগাচার্য—কর্ণ থাকিলে শোনা যায়, কিন্তু কাব্য বিচারের পক্ষে আরো কিছু আবশ্যক।

যুবরাজ—সত্য বটে, কিন্তু আপত্তিকারী কেহ আছে কি?

দিঙ্‌নাগাচার্য—আমি আছি।

পার্শ্বে উপবিষ্ট দেবভট্ট দিঙ্‌নাগের ছায়ায় ছায়া মিশাইয়া একটু উস্‌খুস করিল। তাহার গলায় গলা মিশাইয়া প্রতিধ্বনি করিল, বলিল—আমি আছি।

তখন মহারাজা বলিলেন—বেশ, এ অতি উত্তম প্রস্তাব। আগামী কল্য বিচারান্তে কবিকে পুরস্কৃত করা হইবে।

তখন সভাভঙ্গ হইল।

৮

পরদিন রাজসভায় বিচার আরম্ভ হইল সত্য, কিন্তু রাত্রিবেলাতেই নূতন কাব্য সম্বন্ধে নানা স্থানে নানারূপ মতামত ব্যক্ত হইতে লাগিল—সেটাও একরকম বিচার, এবং বোধ করি, পণ্ডিতের বিচারের চেয়ে তার মূল্য কম নয়।

অনেক রাত্রে যুবরাজ কুমারগুপ্ত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলে পত্নী তাঁহার কণ্ঠে একটি মাল্য পরাইয়া দিয়া বলিলেন—দেবসেনাপতি কুমারের জয় হোক।

কুমার গুপ্ত বলিলেন—আমি আবার দেব সেনাপতি হলাম কখন্?

—কেন, এই যে কিছুক্ষণ আগেই রাজকবি কাব্যে বর্ণনা করলেন।

—ওঃ, সেই কাব্যের কথা বল্‌ছ?

—তুমি তবে কি ভাবলে? কবি বন্ধু থাকবার কত সুবিধা।

—তুমি তো কেবল সুবিধাটুকুই দেখছ।

—অসুবিধা আর কোথায়?

কুমার যে—চিরকুমার! তার এমন লক্ষ্মী পত্নী ছিল না।

—ওঃ, আমি তবে অবান্তর?

—না, কাব্যের অভাব বাস্তবে পূরিয়ে দিয়েছে। ঐখানে কবিত্ব উপরে সংসারের জয়।

—যাই বলো, এমন মধুর কাব্য জীবনে শুনিনি।

কুমার গুপ্ত বলিলেন—কবি কাব্য লিখলে মধুর না হয়ে যায় না। তোমার দেবভট্ট লিখলে দেখতে কি কাণ্ড ঘট্‌তো।

... ...

গৌড়াধিপতির শিবিরে গৌড়াধিপ ও তাঁহার বয়স্তের মধ্যে আলাপ হইতেছিল—

গৌড়াধিপ। লোকটা লিখেছে বটে।

বয়স্য। লিখবে না? খায়-দায় ভালো, কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

—আরে ঝঞ্ঝাটে কি আমার সভাকবি রাসেন্দ্র রাজেরই আছে? লোকটার কাব্য শুনে সরস্বতীর হাঁসগুলো আর্তনাদ করে ওঠে।

—তা' যা বলেছেন মহারাজ!

—এক কাজ করতে পারো। লোকটাকে গৌড়ে নিয়ে যেতে পারো।

—যাবে কি? মহারাজার অনুগৃহীত!

—অবশ্যই যাবে! কাল গিয়ে সহস্র স্বর্ণমুদ্রার লোভ দেখাও! আর সেই সঙ্গে গৌড়ের জলবায়ু ও খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যের বর্ণনাটাও করতে ভুলো না।

—যে আজ্ঞে, কাল একবার যাবো লোকটার কাছে—

—বিক্রমাদিত্যের সভাকবি আমার সভায় গেলে আমার মর্যাদা বাড়বে।

—সে আর বল্‌তে।

... ...

কালিদাসের কুটীরে কালিদাস ও তাহার বন্ধু নিচুলের মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল—

নিচুল। কবি, তোমার ঋতুসংহার, মালবিকা ও বিক্রম সুকাব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু কুমার নিঃসন্দেহ মহাকাব্য, তোমার নাম ব্যাস ও বাল্মীকির সঙ্গে গ্রথিত হ'য়ে গেল।

কালিদাস। বন্ধুপ্রীতিই তোমার প্রশংসার হেতু! ব্যাস-বাল্মীকি ছিলেন ঋষি, লৌকিক কবির নাম তাঁদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য নয়।

নিচুল। তাঁরাও লৌকিক কবি, অলৌকিক তাঁদের প্রতিভা!

কালিদাস। তোমার কথা সত্য হ'লে আনন্দের বিষয়।

নিচুল। সব চেয়ে বিস্ময়কর তোমার সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞান! উমা-পরিণয়ে কাব্যের সমাপ্তি—কুমারের জন্মই হ'ল না। এই যে না-বলার দ্বারা সবটুকু বল্‌লে, ব্যঞ্জনার হাতে বাস্তবের ভার ছেড়ে দিলে, এখানেই তোমার প্রতিভার

পরাকাষ্ঠা। স্বল্পশক্তিমান্ ব্যক্তি কাহিনীর জের শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতো। আর তাতেই মরতো।

কালিদাস। এই জন্যই তো তোমাকে 'সরস নিচুল' বলে থাকি! কিন্তু দেখো, কাল সভায় দিঙ্‌নাগ কি রকম স্থূল হস্তাবলেপ করে!

নিচুল। চমৎকার বলেছ! দিঙ্‌নাগের স্থূল হস্তাবলেপ! দিগ্‌গজের শুঁড়ের স্পর্শ! কথাটা কোন কাব্যে ঢুকিয়ে দাও! অমর হ'য়ে থাকুক।

কালিদাস। সে তো পরের কথা। আগে দিগ্‌গজের শুঁড়ের আক্রমণ থেকে কবি প্রাণে বাঁচুক তো।

নিচুল। নিচুল সরস হ'তে পারে, কিন্তু তাঁরও কাঁটা আছে, হাতীর শুঁড়ে বিঁধবে।

... ...

রাজপুরোহিত ও দেবভট্টের মধ্যে—

দেবভট্ট। কেমন আচার্য, আমি বলেছিলাম কি না! কার্য তো ছাই, কেবল চাটুবাদ! দেখলেন তো কৌশল!

রাজপুরোহিত। সুন্দর! চমৎকার!

দেবভট্ট। আপনিও মুগ্ধ হ'য়েছেন দেখছি!

পুরোহিত। কেন আপনি কি হন নাই? তা ছাড়া চাটুবাদ কোথায়?

দেবভট্ট। কোথায় নয়? যুবরাজ কুমারগুপ্তকে বানিয়ে দিল—কুমার দেব-সেনাপতি! আর ইঙ্গিতে মহারাজা ও মহারাণীমাকে হরপার্বতী বলা হ'ল।

পুরোহিত। তাও বটে।

দেবভট্ট। লিখতে বসেছে হূণবিজয়সংগ্রাম! তার মধ্যে এই পৌরাণিক কাহিনী আসে কোথা থেকে? আর এত কাহিনী থাকতে কি না বেছে বেছে সেই কাহিনী অবলম্বন করলো, যার মধ্যে কুমার নামটি আছে। ধূর্ত! শঠ! প্রবঞ্চক! চাটুকার!

পুরোহিত। আপনি একবার দিঙ্‌নাগ ঠাকুরকে বুঝিয়ে বলুন না কেন, কাল তো তিনি বিচারে অবতীর্ণ হবেন।

দেবভট্ট। আপনি কি ভাবছেন, তা আমি করিনি! সমস্ত বুঝিয়ে বলেছি। আমার গৃহিণী যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেছিলেন, অমনি তাও কিছু দিয়ে এসেছি।

পুরোহিত। ঠাকুর কি বলছেন?

দেবভট্ট। দেখলাম, পণ্ডিতপ্রবর রসগ্রাহী। তিনি বললেন, যার গৃহিণী মিষ্টান্ন প্রস্তুতে এমন দক্ষ, তিনি যে মধুর কাব্য রচনা করবেন, তা আর বিস্ময়ের কি?

পুরোহিত। তবে তো কাজ পাকা করেই এসেছেন।

দেবভট্ট। তা এসেছি—এখন মহারাজা বুঝ্‌লে হয়! রাজারা আবার চাটুবাদে সহজেই মুগ্ধ হয়!

... ...

বিনিদ্র দিঙ্‌নাগাচার্য একাকী পদচারণা করিতেছেন, মুখমণ্ডলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার সঙ্গে প্রতিহিংসার ভাব মিশ্রিত। পদচারণা করিতে করিতে একবার থামিতেছেন—আর আবৃত্তি করিতেছেন—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে,
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥"

অহো কি দম্ভ! 'ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।' ভালো, আগামী কল্য সেই বিচারই হবে! 'বৃদ্ধ হইলেই পণ্ডিত হয় না আর নূতন হইলেই কাব্য হয় না! সেই কথাই কাল প্রমাণ ক'রে দেবো—যে, বৃদ্ধ হলেও পণ্ডিত হতে পারে—আর নূতন হ'লেও কাব্য হয় না! এ তো আমাকে লক্ষ্য করেই লিখিত!

এই বলিয়া একবার তিনি নীরব হইলেন, থামিলেন, আবার বলিতে লাগিলেন—মহারাজার আশ্রিত হ'লেই মহাকবি হয় না!

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি একবার আকাশের দিকে চাহিলেন, বলিলেন—আঃ, রজনী যে প্রভাত হ'তেই চায় না অথবা দুর্জনের অধিকার স্বভাবতই বিস্তৃত মনে হয়!

দিঙ্‌নাগাচার্য ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে পদচারণা করিতেই লাগিলেন।

... ...

পরদিন রাজসভায় সকলে সমবেত হইলে মহারাজা পণ্ডিত দিঙ্‌নাগকে বিচারে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিলেন। দিঙ্‌নাগ শুধাইলেন, উত্তরপক্ষ কে হইবে?

নিচুল বলিল—আমি প্রস্তুত।

কিশোরোপম মানুষটির দিকে চাহিয়া দিঙ্‌নাগ অনুকম্পায় হাসিল, বলিল—উত্তম! তাই হোক।

তখন দিঙ্‌নাগ আরম্ভ করিল—রচনাটিকে লেখক মহাকাব্য বলিয়াছে, কিন্তু মহাকাব্য তো দূরের কথা, কাব্যই হয় নাই।

নিচুল বলিল—দূরের কথাকে নিকটে আনিতে আজ্ঞা হোক, কেন মহাকাব্য হয় নাই?

দিঙ্‌নাগ। নবম সর্গের কমে কাব্য মহাকাব্যে পরিণত হয় না, কাব্যখানি মাত্র সপ্তসর্গ!

নিচুল। তবে তো এই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে মহৎ শব্দ প্রযোজ্য নয়, কেন না—ইহাও মাত্র সপ্ত সর্গে সম্পূর্ণ!

দিঙ্‌নাগ। বাচালতা পরিহার করো, যুক্তির পন্থায় অবতীর্ণ হও।

দিঙ্‌নাগ যখন এই সব কথা বলিতেছিল, তখন পার্শ্বে উপবিষ্ট দেবভট্ট মস্তক নাড়িয়া তাঁহাকে সমর্থন করিতেছিল—ভাবটা, এমন যুক্তিগ্রাহী বাক্য আর হয় না, সুযোগ পাইলে সেও বলিতে পারিত।

নিচুল বলিল—উপমাও এক প্রকার যুক্তি! কিন্তু তাহা যদি গ্রাহ্য না হয়—তবে অন্য যুক্তি দিতেছি। মহত্ত্ব কি বস্তুর গুরুত্বের উপরে নির্ভর করে? কারো কারো পক্ষে তাহাই একমাত্র নির্ভর।

এই বলিয়া সে দিঙ্‌নাগের গুরুভার দেহের প্রতি একবার কটাক্ষ করিল। অনেকে বুঝিল, বুঝিয়া হাসিল।

দিঙ্‌নাগ বলিল—এদেশে দেখিতেছি, বাচালতাই যুক্তির স্থান অধিকার করিয়াছে।

নিচুল। মূঢ় যুক্তির চেয়ে বাচালতা অনেক সরস! কিন্তু ভালো, জিজ্ঞাসা করি, মহাকাব্যের মহত্ত্ব তাহার প্রকৃতিতে, না আকৃতিতে—যদি আকৃতিতে হয়, তবে অবশ্যই আমার কিছু বলিবার নাই। আর যদি প্রকৃতিতে হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, কুমারসম্ভবম্ কাব্যের চেয়ে মহত্তর আর কি হইতে পারিত? দৈত্যকবল হইতে স্বর্গউদ্ধারের নিমিত্ত বীরের জন্ম, মানুষের প্রতিভা আর কি মহত্তর কল্পনা করিতে সমর্থ?

দিঙ্‌নাগ। কিন্তু জন্মটা কোথায়? আসল ব্যাপারই যে উহ্য থাকিয়া গেল!

নিচুল। সূতিকাগৃহের ভূমিষ্ঠ শিশুর ক্রন্দন না শুনিলে যাহারা জন্ম ব্যাপারটাকে কল্পনা করিতে অসমর্থ, তাহারা উত্তম সামাজিক জীব হইতে পারে, কিন্তু কাব্য সমালোচনার অধিকারী নয়।

দিঙ্‌নাগ। শুধু জন্মটাই তো উহ্য নয়, কাব্যের আসল বিষয়টাই যে অনুক্ত রহিয়া গিয়াছে! কোথায় জন্ম, কোথায় কুমার, কোথায় দেবদৈত্যে সংগ্রাম, আর কোথাই বা স্বর্গের উদ্ধার?

নিচুল। কার্যের প্রাণ ব্যঞ্জনায়। সবটুকুই যদি করিতে হইবে, তবে তো ইতিহাস হইয়া গেল!

দিঙ্‌নাগ। তাই বলিয়া কি আসল কথা অনুক্ত রাখিতে হইবে!

নিচুল। আসল কথা অবশ্যই কথিত হইয়াছে—সেইটুকুই কাব্যের বীজ! এবারে রসিক পাঠক তাহার রসবোধের দ্বারা বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া লইবেন—যথার্থ কবিরা ইহাই আশা করিয়া থাকেন। সে শক্তি যাহাদের নাই, তাহারা ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের কচ্চায়ন লইয়া থাকুক, কার্যের ক্ষেত্রে অনাগমনই বাঞ্ছনীয়।

দিঙ্‌নাগ। এ কি বিচার?

দেবভট্ট মাথা নাড়িল।

নিচুল। আপনি যাহা করিতেছেন, তাহার নাম অবিচার।

ক্রুদ্ধ দিঙ্‌নাগ বৃংহণ করিয়া উঠিল, তুমি অর্বাচীন।

নিচুল। কিন্তু আপনিও প্রাচীনের ন্যায় কথা বলিতেছেন না।

ঈষৎ লজ্জিত হইয়া দিঙ্‌নাগ বলিলেন—আমার বক্তব্য এই যে, রচনাটি মহাকাব্য নয়, তার উপরে আবার অসমাপ্ত। আর এমন রচনাকে সম্মানিত করিয়া মহারাজা রসগ্রাহীর কাজ করেন নাই।

নিচুল। মহারাজ রসগ্রাহীর কাজই করিয়াছেন—এমন হইতে পারে যে, তিনি আলঙ্কারিকের কাজ করেন নাই।

যখন দুই পক্ষে এইরূপ যুক্তির ও শ্লেষের বর্ষণ চলিতেছিল, তখন সভাস্থ সকলে নিজ নিজ রুচি অনুসারে কেহ বা এক পক্ষ, কেহ বা অপর পক্ষ অবলম্বন করিতেছিল। কাল তাহাদের অনেকেরই কাব্যখানি ভালো লাগিয়াছিল, আজ অনেকেই বুঝিতে পারিল যে, ভালো লাগা উচিত হয় নাই। প্রেমের অভাব অলঙ্কার দ্বারা ঘুরাইয়া লইতে হয়—যাহাদের হৃদয় প্রেমপূর্ণ, তাহারা সুবর্ণ অলঙ্কারের অভাব অনুভব করে না।

সভাস্থ বৃদ্ধ জনেরা মনে মনে দিঙ্‌নাগের যুক্তি সমর্থন করিতেছিল—আর নিচুলের শ্লেষাত্মক যুক্তি তরুণগণের বড় ভাল লাগিতেছিল।

এমন সময় বৃদ্ধ রাজপুরোহিত বলিলেন—মহারাজ, আমি কবিও নই, আলঙ্কারিকও নই, আমি মহারাজার মঙ্গলকামী বৃদ্ধ। আমার বক্তব্য এই যে—এমন শুভ উৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত অসম্পূর্ণ কাব্য শুভসূচক নয়, বস্তুতঃ অমঙ্গল-জনক বলিয়াই মনে হয়।

দেবভট্ট তিন চার বার মাথা নাড়িল।

রাজপুরোহিত বলিলেন—তর্ক থাক্‌, আমার বোধ হয়, কাব্যখানি সম্পূর্ণ করিয়া ফেলা কবির উচিত।

নিচুল। সম্পূর্ণকে সম্পূর্ণতর করিবার উপায় কি? রোহিত মৎস্যকে টানিলে কি তিমি মৎস্যে পরিণত হইবে?

দিঙ্‌নাগ। কিম্বা পুটিকা মৎস্যকে রোহিত বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলেই কি সার্থক হইবে? আমার মনে হয়, রাজপুরোহিতের বাক্য যথার্থ।

এবারে যুক্তির স্থানে ভক্তি আসিয়া দেখা দিল। মঙ্গলামঙ্গলের তর্কে

অনেকেরই মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল! কাব্য অতি উত্তম পদার্থ, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে মঙ্গলের উপরে স্থান দেওয়া যায় না বলিয়া সকলের ধারণা হইল!

অনেকেই অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল—তাই তো কাব্যখানা যে অসম্পূর্ণ!

কেহ কেহ বলিল—অসম্পূর্ণ কাব্যে শুভ উৎসব খণ্ডিত হইল!

এমন সময় সকলে দেখিতে পাইল, অলিন্দের শ্বেতপাথরের সোপান বাহিয়া প্রভাতের শুকতারার ন্যায় একজন রমণী নামিতেছে, সকলেই চিনিল—আর্যা শিলাবতী।

শিলাবতী ধীরপদে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া মহারাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল—মহারাজার অনুমতি অন্তে আমি কিছু বলিতে চাই।

এই বলিয়া সে আরম্ভ করিল—মহারাজ! কাব্যের বাহ্য অসম্পূর্ণতায় উদ্বিগ্ন হইবেন না—স্বয়ং মহাদেবী প্রসন্ন হইয়াছেন। এই বলিয়া শিলাবতী স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।

এবারে ভক্তির প্রতিষেধক ভক্তি পড়িল। অমঙ্গলের আশঙ্কায় যাহারা উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, স্বপ্নবৃত্তান্তে তাহারা নিশ্চিন্ত হইল। এমন কি, কালিদাসের উষ্ণীষচূড়ায় বইটি লক্ষ্য করিয়া তাহারা এক প্রকার ঈর্ষামিশ্রিত পুলক অনুভব করিল।

শিলাবতী বাক্য শেষ করিবামাত্র দিঙ্‌নাগ গর্জন করিয়া উঠিল—এবারে উত্তম হইয়াছে। আর্যাবর্তের একচ্ছত্র অধিপতির সভায় কাব্যবিচারক শেষে কি না নারী! যেমন কাব্য, তেমনি বিচারক—আর তেমনি রসগ্রাহী বলিয়া শিলাবতী ও নিচুলের দিকে কটাক্ষ করিলেন।

তখন মহারাজা বিক্রমাদিত্য বলিলেন—তর্ক বিতর্ক ক্ষান্ত হোক, কবি, তুমি কাহিনীর প্রত্যাশিত চূড়ান্ত অবধি কাব্যকে টানিয়া লইয়া যাও।

মহারাজার বাক্যে সভাজন ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। রাজবাক্য সমর্থন জ্ঞাপনের জন্যই সভাসদের প্রয়োজন।

কালিদাস উত্তর করিল না।

মহারাজা পুনরায় বলিলেন—রাজপরিবারের মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে আপত্তি করা উচিত নয়।

এবারে কালিদাস কথা বলিল—মহারাজ, আপনি আমার অন্নদাতা, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। কিন্তু আরও একটা আদেশ আছে—স্বয়ং সরস্বতীর আদেশ—তাহাকে লঙ্ঘন করি কি বলিয়া ?

—সে আদেশ কি ?

—কাব্যের একটা দাবী আছে, সেই দাবী যথাসাধ্য রক্ষা করিয়াছি—যাহা সমাপ্ত, তাহার উপরে আর লেখনী চালনা করা উচিত নয়।

প্রিয়ম্বদ কবির এবম্বিধ বাক্যে মহারাজা নিতান্ত বিস্মিত হইলেন,—রুষ্টও কম হইলেন না।

তখন তিনি বলিলেন,—ভালো, তুমি শেষ না করিতে পারো, অন্যের উপরে সে ভার দিতে বাধ্য হইব।

তারপরে দেবভট্টের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—পণ্ডিত, তুমি কাব্যের শেষাংশ পূরণ করিয়া দাও।

দেবভট্ট এক লম্ফে মহারাজার পায়ের কাছে আসিয়া—পায়ের ধুলা লইয়া বলিল—মহারাজার আদেশ ও পদধূলি অবশ্যই শিরোধার্য—আমি অচিরে উহা সম্পূর্ণ করিয়া দিতেছি। রাজবংশের মঙ্গলামঙ্গলের চেয়ে কাব্যের দাবী আমার কাছে অধিক গুরুতর নয়।

রাজা বলিলেন—তথাস্তু। আমি খুশী হইলাম।

রাজাদের অবশ্যই কাব্যে প্রীতি থাকে—কিন্তু আত্ম-প্রীতির চেয়ে বেশী নয়।

তিনি কালিদাসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—তুমি কল্য প্রাতেই রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নির্বাসনে যাইবে।

দিঙ্‌নাগ বলিলেন—ইহাই রাজার উপযুক্ত বিচার !

রাজ-কবি রাজসভার ভূষণ। তাহার অভাবে আর যে হানিই হোক, অঙ্গহানি কখনোই হয় না।

রুষ্ট বিক্রমাদিত্য সভা পরিত্যাগ করিলেন। সভা ভাঙিয়া গেল।

১০

নিশান্তের অন্ধকারে মহাকালমন্দিরের প্রচ্ছন্নতর অন্ধকারে তিন ব্যক্তি মিলিত হইল। কালিদাস, নিচুল ও শিলাবতী।

কলিদাস বলিল—শিলাবতি, আমাকে বিদায় দাও, আমার যাত্রাকাল আসন্ন।

তার পরে বলিল—নিচুল, কিয়ৎদূর আমার সঙ্গে যাবে।

শিলাবতী। তুমি কোথায় যাবে ?

—রামগিরিতে। সেখানেই যাইবার আদেশ হইয়াছে।

শিলাবতী। তোমাকে মহারাজা পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু দেবী সরস্বতী তোমার সঙ্গেই চলিলেন !

—এখন তবে বিদায় হই ?

শিলাবতী। তোমার এই অপমানের অন্ধকার ভেদ করিয়া মহত্তর কাব্যের সূর্যোদয় হইবে। আজিকার নির্বাসনের অভিজ্ঞতা কাব্যে গাঁথিয়া দিও। তোমার ও তোমার কাব্যের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম। মহাকাল তোমাকে রক্ষা করিবেন।

তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে ছায়ার মতো কালিদাস ও নিচুল ধীরে ধীরে অদূরে মিলাইয়া গেল। শিলাবতী কুটীরে ফিরিয়া চলিল।

যক্ষের প্রত্যাবর্তন

সকাল বেলাতেই তূরী ,ভেরীর নিনাদে, অশ্বের হ্রেষায়, হস্তীর বৃংহিতে বনভূমি উচ্চকিত হইয়া উঠিল। উদ্দালক ও অখণ্ডপুণ্য ছুটিয়া গৌতমের কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল, বলিল—তাত, তপোবনের প্রান্তে সৈন্য-সামন্ত এবং হস্তী অশ্ব প্রভৃতি দেখা যাইতেছে। আমরা বিপদের আশঙ্কা করিতেছি।

গৌতম বলিলেন—বিপদের কারণ দেখি না। তোমরা বরঞ্চ যক্ষের কাছে গিয়া সমস্ত নিবেদন করো, সে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সবিশেষ কারণ জানিয়া লইবে। আমি এখন যজ্ঞে বসিতেছি।

তখন ঋষিবালকদ্বয় যক্ষের কুটীরের দিকে চলিল।

ঋষির আশ্রমের অপর প্রান্তে শৈলমূলে যক্ষের কুটীর। সে গৌতমের আশ্রিত, কিন্তু ঠিক গুরু ও শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত নহে।

তাহারা যক্ষের কুটীরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল যে, পুস্তকাকারে কর্তিত তালপত্রে সে লিখিতে ব্যস্ত। তাহারা জানিত, যক্ষের কাব্য রচনার বাতিক আছে।

উদ্দালক ডাকিল—যক্ষ!

যক্ষ মুখ তুলিয়া তাহাদের দেখিয়া বলিল—কি বৎস?

উদ্দালক বলিল, আর্য গৌতম আমাদের তোমার কাছে পাঠাইলেন।

—কেন বলো তো?

অখণ্ডপুণ্য উদ্দালকের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। সে বলিল—তুমি কবিতা লিখিতেছ, জানিবে কি প্রকারে? বাহিরে গোলমাল শুনিতে পাও নাই?

যক্ষ বলিল—না শুনিয়া উপায় কি! শোনাইবার উদ্দেশ্যেই লোকে গোলমাল করিয়া থাকে।

উদ্দালক বলিল—আমরা বিপদের আশঙ্কা করিতেছি।

যক্ষ বলিল—বিপদের কারণ নাই।

—তবে উহারা কে?

—কোন রাজপুরুষ হইবেন।

—এখানে কেন?

—রাজপুরুষগণ কেন যে কোথায় যান, তাহা মানুষে জানিবে কি করিয়া?

অখণ্ডপুণ্য। তুমিও জানিতে পারিবে না?

যক্ষ। আমাতে বৈশিষ্ট্য কি?

অখণ্ডপুণ্য। তুমি তো যক্ষ?

যক্ষ দেখিল, এবারে সে ঠকিয়া গিয়াছে। যক্ষ বলিয়াই নিজের পরিচয় দিয়াছিল। আর সে যখন যক্ষ অর্থাৎ মানুষ নয়, তাহার না জানিবার কোন হেতু নাই।

যক্ষ হাসিয়া বলিল—যাহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূরে আসিয়াছে, আগমনের কারণ তাহারা না জানাইয়া যাইবে না। ও পরিশ্রমটুকু আমরা নাই করিলাম।

উদ্দালক। অখণ্ডপুণ্য যে ভয় পাইয়াছে।

অখণ্ডপুণ্য প্রতিবাদ জানাইয়া বলিল—আমি ভয় পাইব কেন? লোকের ভয় করিতেছে।

উদ্দালক গম্ভীর ভাবে বলিল—ঐ একই কথা।

যক্ষ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, তোমরা কেউই ভয় পাও নাই। কিন্তু এখন বলো, আমাকে কি করিতে হইবে?

উভয়ে একত্র বলিল—বিষয়টা কি, সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

তখন তিনজনেই দেখিল, বনের দিগন্ত ঘেরিয়া একটা শব্দের ইন্দ্রজাল যেন উত্থিত হইয়াছে, তার মধ্যে কত বিচিত্র ধ্বনির মিশ্রণ; তূরী ভেরী, হ্রেষাবৃংহিত, রথচক্র ঘর্ঘর, কর্কশ কণ্ঠস্বর; সব মিলিয়া মিশিয়া সে এক অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাপার।

যক্ষ বলিল—লোকজন বনে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু এখনো তপোবনে প্রবেশ করে নাই।

তারপরে বলিল,—আচ্ছা তোমরা যাও, আমি সমস্ত সন্ধান করিয়া আচার্য গৌতমের কুটীরে যাইতেছি, ততক্ষণে তাঁহার যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে।

যক্ষের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ঋষিবালকদ্বয় প্রস্থান করিল।

যক্ষ তালপত্র ও লেখনী যথাস্থানে রক্ষা করিয়া কুটীরের বাহিরে আসিল; দেখিল, বালক দুটি উডুম্বর বৃক্ষের ডাল ভাঙিতেছে। অপরে হইলে ভাবিত যে, ঋষিবালক যজ্ঞসমিধ সংগ্রহে নিযুক্ত। কিন্তু যক্ষ সেরূপ ভুল করিল না। মানবচরিত্রে অভিজ্ঞ সে বুঝিল, ক্রীড়ার উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে। ঋষিবালকও যে বালক, এ কথা যে না বোঝে, সে মানবচরিত্র সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

২

বিষয়টির সন্ধান লইবার উদ্দেশ্যে যক্ষ কুটীর হইতে বাহির হইল, বাহির হইয়া দিগন্তের দিকে চাহিবামাত্র 'চিত্রার্পিতবৎ' দাঁড়াইয়া পড়িল, সে যেন চলাও নয়, থামাও নয়। সে দেখিল, দিগন্তের গিরিমালা ও মেঘমালায় জড়াইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। যেখানে গিরিশৃঙ্গ উচ্চ, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দলবদ্ধ হস্তিশাবকের ন্যায়—সেখানে পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতেছে—এখনি উচ্চতম শিখরে গিয়া পৌছিবে। কোন কোন স্থানে সমুদ্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দ্বীপমালার ন্যায় ইতস্ততঃ গিরিচূড়াগুলি জাগিয়া আছে। আরও দূরের উচ্চতর গিরিশিখরগুলি একটার মাথার উপর দিয়া আর একটা উঁকি মারিতেছে, তাহাদের কৌতূহলের অন্ত নাই। আকাশের মেঘ আর পৃথিবীর পাহাড় আজ যেন রূপ বিনিময় করিয়াছে, অভ্যস্ত চোখ ছাড়া ধরিতে পারে না। পূর্বাকাশে প্রকাণ্ড এক খণ্ড মেঘ জটায়ুর পাখার মতো ক্রমশঃ বিস্তারিত হইয়া পড়িতেছে, তাহার পালকের খাঁজে খাঁজে বিদ্যুতের বনফুল সংলগ্ন। পৃথিবীতে মেঘের ছায়া মেঘের সীমানাকে ছাড়াইয়া আগে আগে চলিতেছে, যেখানে ছায়া, সেখানে নীল, অন্যত্র ঘন সবুজ, ওরই মধ্যে যেখানে রোদের আভাস, সেখানে সোনালী সবুজ; ছায়ার বন্যায় ধরাতল ক্রমে ডুবিয়া যাইতেছে। অরণ্যের বনস্পতির শীর্ষগুলি যুদ্ধাশ্বের মতো উৎকর্ণ।

পাহাড়ের গায়ে ছায়াবদলের পালা চলিতেছে, নীল, ঘন নীল, ফিকা নীল; শ্যাম, শষ্পশ্যাম, শুকশ্যাম; ওখানে কে যেন সোনার তবকে মুড়িয়া দিতেছে; হঠাৎ আগাগোড়া কে যেন অমাবস্যার কাজলে লেপিয়া দিল; কালো কেশ-পাশের মাঝখানে হঠাৎ সিঁদুর ফুটিয়া উঠিল; কোন্ চঞ্চল দায়িত্বহীন দেবশিশু যেন রঙের ভাণ্ডার লইয়া তচনচ্ করিতেছে, নিষেধ করিবার কেহ নাই। আকাশ ও পৃথিবী মেঘমায়ায় বাসরগৃহের তমিস্রার মতো রহস্যময়। মন অকারণ আকুল করিয়া দেয়। যক্ষের মনে হইল, যে ব্যক্তি স্ত্রীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া আছে, তাহারও চিত্ত যখন ব্যাকুল হয়—দূরস্থ বিরহীর অবস্থা তো সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

একটি ফুটন্ত কুটজ বৃক্ষের পাশে আর একটি বৃক্ষের মতো যক্ষ মূঢ়ের মতো নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল।

মেঘ অপসারিত হইয়া গেলে যক্ষ দেখিতে পাইল, উপত্যকার সমতল ভূমি হইতে বনস্পতিসমূহ থাকে থাকে সারে সারে পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিয়া গিয়াছে। কত বার এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার রাজসভার চিত্র মনে পড়িয়া গিয়াছে—এইমাত্র সম্রাট্ প্রবেশ করিলেন, সভাসদ্‌গণ দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই বনস্পতিগুলির মতোই প্রাচীন। আজ এই দৃশ্য দেখিয়া স্মৃতির সূত্রে যক্ষের মনে রাজসভার চিত্র জাগিল। সেই সভা, সেই গৌরবময় আনন্দের দিন, সেই কোলাহলময় বিচিত্র রাজধানী, সেই বন্ধুবান্ধব, সেই নিভৃত-চারিণী, রহস্যময়ী দেবী শিলাবতী—সেই জননান্তরসৌহৃদানি!

রাজসভা হইতে নির্বাসিত হইয়া কত জায়গাতেই না যক্ষ আশ্রয়ের জন্য ঘুরিয়াছে। রাজরোষের কথা শুনিয়া কেহ আশ্রয় দিতে চাহে নাই। তারপরে ঘুরিতে ঘুরিতে রামগিরি শৈলমূলে গৌতম ঋষির এই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌতম আশ্রয় দিলেন, বলিলেন—এখানে নির্ভয়ে বাস করুন, যতদিন খুশী থাকুন, কেহ কোনরূপ প্রশ্ন করিবে না।

গৌতম শুধাইলেন—আর্যের নাম?

আগন্তুক বলিলেন—যক্ষ।

আশ্রমের সবাই তাহাকে যক্ষ বলিয়াই জানে, যক্ষ বলিয়াই ডাকে।

সেই হইতে যক্ষ রামগিরি শৈলমূলে 'খরস্রোতা' তটিনীতীরে গৌতম ঋষির এই আশ্রমে বাস করিতেছে।

কত বার আষাঢ়ের প্রথম দিবসে এমনি মেঘ জমিয়া আসিয়াছে, মেঘের উপরে মেঘ, স্তরে স্তরে মেঘমালার দিকে চাহিয়া তাহার রাজধানীর সৌধমালার কথা মনে পড়িত, আর সেই মেঘের মধ্যে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎসঞ্চার দেখিয়া রাজধানীর সৌধ-বাতায়নে পুরসুন্দরীগণের যাতায়াত মনে পড়িয়া যাইত—মূঢ়ের ন্যায়, মুগ্ধের ন্যায় যক্ষ সেই দিকে তাকাইয়া থাকিত ; কামী জন স্বভাবতই চেতন অচেতন সম্বন্ধে হতবুদ্ধি। আর তাহার মনে পড়িত, সেই সব স্মৃতির সৌধমালার একটির একান্তে দিগন্তশায়িনী ম্লানজ্যোতি চন্দ্রকলার ন্যায় বিরহবিশুষ্কা একটি তন্বীর চিত্র। যখন রাজধানীর দিক্ হইতে বাতাস বহিত, আকুল আগ্রহে যক্ষ তাহাকে আলিঙ্গন করিত, যদি তাহার মধ্যে কলাবশেষা সেই তন্বী চন্দ্রলেখার স্পর্শ থাকিয়া থাকে। হায় রে বিরহীর মুগ্ধ দুরাশা !

আজও যক্ষ সেই ভাবে তাকাইয়া রহিল। অভীষ্ট কার্য ভুলিয়া গেল। কতক্ষণ এই ভাবে থাকিত বলা যায় না। এমন সময়ে তাহাকে চকিত করিয়া তাহার সম্মুখ দিয়া কি একটা পশু ছুটিয়া গেল। যক্ষ সচেতন হইয়া দেখিল—ধাবমান পশু একটি কৃষ্ণসার মৃগ।

কৃষ্ণসার এমন প্রাণভয়ে ছুটিতেছে কেন ? তপোবনের পশুকুল স্বভাবতই নিঃশঙ্ক। তবে কি কেহ মৃগয়ায় আসিয়াছে ? অদূরে বিলীয়মান মৃগটির দিকে তাকাইয়া যক্ষ দেখিল, বাণপতনাশঙ্কায় তাহার পশ্চার্ধ যেন দেহের সম্মুখভাগে ঢুকিয়া পড়িয়াছে ! হরিণটা নিশ্চয়ই মৃগয়ার্থীর ভয়ে ধাবমান।

তাহার আশঙ্কাকে সত্য করিয়া ধনুর্বাণ হস্তে এক ব্যক্তি সহসা আবির্ভূত হইল।

যক্ষ চীৎকার করিয়া বলিল—মহাশয়, বাণ সম্বরণ করুন, আশ্রমমৃগ বধের অযোগ্য।

এই বাক্য শ্রবণে ধনুর্বাণধারী থামিল, ধনুর্বাণ সম্বরণ করিল এবং যক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল।

তারপরে যক্ষকে চিনিতে পারিয়া সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—বন্ধু, সখা, সুহৃদ্, তুমি এখানে? এবারে যক্ষও তাহাকে চিনিতে পারিল, বলিল—নিচুল, বন্ধু তুমি? এ যে স্বপ্নের অতীত!

নিচুল। সখা, তোমার সন্ধানেই আমরা বনে বনে ঘুরিয়া মরিতেছি।

কালিদাস। কেন?

নিচুল। তোমাকে রাজধানীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার আদেশ।

কালিদাস। কাহার আদেশ?

নিচুল। এরূপ আদেশ আর কে দিতে পারে? মহারাজ।

কালিদাস। তোমার সঙ্গে আর কে আসিয়াছে?

নিচুল। আমি কাহার সঙ্গে আসিয়াছি বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করো।

কালিদাস। ভালো, তাহাই বলো।

নিচুল। আমরা যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের সহযাত্রী।

কালিদাস। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত? তবে কি…?

নিচুল। হাঁ, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সে আজ বর্ষকাল হইল। এখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মহারাজ কুমারগুপ্ত।

কালিদাস। আহা, স্বর্গীয় মহারাজ অশেষ গুণধাম ছিলেন।

নিচুল। মহারাজ কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তোমার সন্ধানের আদেশ দিয়াছেন। চারি দিকে রাজানুচরগণ গিয়াছেন। এদিকে আসিয়াছেন স্বয়ং স্কন্দগুপ্ত। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমিই প্রথম তোমার সন্ধান পাইলাম।

কালিদাস। মহারাজের আমার বিষয় কি আদেশ?

নিচুল। তোমাকে সসম্মানে রাজধানীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।

কালিদাস। যুবরাজ কোথায় গেলেন?

নিচুল। তিনি বিদূষক বামণকের সঙ্গে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। …এই কি তোমার কুটীর? চলো একটু বসি, বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

কালিদাস। চলো, একেবারে গৌতমের কুটীরে গিয়া বসি। তোমাদের আগমনকোলাহলে তাঁহারা বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

কালিদাস ও নিচুল গৌতমের কুটীরের দিকে যাত্রা করিল। তাহারা কিছুদূর আসিয়াই দেখিতে পাইল, একটি সরোবরতীরে বিদূষক বামণক অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

তাহাদের দেখিবামাত্র বামণক বলিয়া উঠিল—এই যে সীতার সন্ধান মিলিয়াছে। যাক্ বাঁচা গেল।

নিচুল। তোমার এমন দশা কেন?

বামণক। আমি ছিন্নপক্ষ জটায়ু।

নিচুল। যুবরাজ কোথায়?

বামণক। যুবরাজ কোথায়? বলো রামচন্দ্র।

কালিদাস। তিনি কি মৃগের পিছনে ছুটিলেন?

বামণক। মৃগই বটে, তবে স্বর্ণমৃগ।

নিচুল। কেমন?

বামণক। কেমন আর কি, যেমনটি হওয়া উচিত।

নিচুল। রহস্য রাখো, স্বরূপ বলো।

বামণক। মৃগের পিছনেই ছুটিতেছিলেন, সহসা সম্মুখে এক গাছের ছাল-পরা ঋষিকন্যাকে দেখিয়া তাহার পিছু লইলেন।

নিচুল। যাক্, মৃগটা বাঁচিল।

বামণক। কিন্তু সেই বেটীর অবস্থা এতক্ষণে কি হইল, তাহাই ভাবিতেছি।

নিচুল। তোমার অবস্থা তো ভালই দেখিতেছি।

বামণক। ভাল বই কি। একে বনে বনে ঘুরিয়া গায়ের, পায়ের ব্যথা, তার উপরে যুবরাজ এখন পড়িলেন ডাইনির কবলে। গোদের উপর বিষফোড়া আর কি!

কালিদাস। ঋষিকন্যার জন্য চিন্তা করিও না।

বামণক। না, সে চিন্তা করিবার জন্য তুমিই আছ। তাই বলি, রাজধানী

ছাড়িয়া নাকি সুখেই মজিয়া আছো। যুবরাজও যে আর শীঘ্র ফিরিবেন মনে হয় না। বড়লোকের কথাই আলাদা, পিণ্ডখর্জুর খাইয়া মুখ মরিয়া গিয়াছে—এখন কিঞ্চিৎ তিন্তিড়ির আবশ্যক।

কালিদাস। এখানে বসিয়া হা-হুতাশ করিয়া লাভ নাই। চলো, ঋষির কুটীরে চলো—পুরোডাস ও গুবাগু মিলিতে পারে।

বামণক। পারে নাকি! আহা, এ যে নন্দনকানন। কে বলিল ইহাকে অরণ্য! যতদিন ঐ সব বস্তু প্রচুর পরিমাণে মিলিবে—আমি এখান হইতে নড়িব না, যুবরাজের মৃগয়াও ধীরে সুস্থে চলিতে থাকুক।

তখন তিন জনে ঋষির কুটীরের দিকে চলিল।

নিচুল। কবি, সবশুদ্ধ ব্যাপারটা মিলিয়া তোমার কোন অলিখিত নাটকের যেন প্রথম অঙ্কটা!

বামণক। এখন ঐ ঋষিকন্যা যুবরাজের অঙ্কগত হইলে নাটকের আর একটা অঙ্কপাত হইতে পারে। ঠাকুর, তোমার সেই অলিখিত নাটকখানার নাম দিও 'শকুন্তলা'—এ যেন তাহারই দৃশ্যের পর দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়া চলিয়াছে।···ঠাকুর, ঋষিপত্নী রন্ধনে নিপুণ তো!

৩

গৌতম অতিথিগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। যক্ষের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া পরম গৌরব অনুভব করিলেন, বলিলেন,—কবি, আমরা অরণ্যবাসী হইলেও কুমারসম্ভবকাব্যের কবির নাম আমাদের নিকটে অজ্ঞাত নয়। কিন্তু প্রকৃত নাম গোপন করিবার উদ্দেশ্য কি?

কালিদাস বলিল—অগৌরবের স্মৃতি কে কীর্তন করিতে চায়? আমার নাম যখন আপনার জ্ঞাত, আমার নির্বাসনের কাহিনীও নিশ্চয় আপনার অজ্ঞাত নয়।

গৌতম। যথার্থ বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ যক্ষ নামটি নির্বাচনের রহস্য কি?

কালিদাস। নিজেকে যক্ষ নামের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আমার নির্বাসিত জীবনের কাহিনী অবলম্বন করিয়া একখানি কাব্য রচনা করিয়াছি।

নিচুল। বেশ হইবে, রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই রাজসভাতে উহা পাঠ করিতে হইবে।

—না, যেখানে প্রথম রচনা, সেখানেই প্রথম পাঠ করা কর্তব্য।

সকলে পিছন ফিরে দেখিল স্বয়ং যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত।

গৌতম উঠিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। যুবরাজ তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া উপবেশন করিল।

বামণক বলিল—কাব্যখানা পাঠ করিবার আগে কিছু আহার করিয়া লইলে হইত না! তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ দিবার সুযোগ পাওয়া যাইত।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

গৌতম। আর্য, তোমার কথাই যথার্থ। সকল রসের মূলাধার জঠর। তাহাকে শান্ত করিয়াই অগ্রসর হওয়া উচিত।

কৃতজ্ঞ বামণক নিচুলের দিকে তাকাইয়া বলিল—এমন অন্তর্যামী না হইলে আর ঋষি!

স্থির হইল যে, আহার ও বিশ্রামের পরে গৌতমের কুটীর-প্রাঙ্গণে অপরাহ্লে মহাকবি কালিদাসের নূতন কাব্য পঠিত হইবে।

গৌতম বলিলেন—আমি অবিলম্বে চারিদিকের ঋষিপত্তনগুলিতে সংবাদ পাঠাইয়া দিতেছি, সকলেই আসিবেন।

তখনি তিনি উদ্দালক, অশ্বগুপুণ্য ও অন্যান্য ঋষিবালকগণকে সংবাদ দিবার আদেশ দিলেন। আর ঋষিকন্যাগণকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, তোমরা পঞ্চবটীর অঙ্গন বেশ পরিষ্কার করিয়া রাখো—আজ তৃতীয় প্রহরে সেখানে আর্যগণ সমবেত হইবেন।

ঋষিকন্যাগণ প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে বামণক একজনকে বলিল—মাতঃ, তোমাদের মহানসের পথটা আমাকে দেখাইয়া দাও তো।

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল।

*

বামণক বলিল—ঋষিবাক্য ইতিমধ্যেই ভুলিয়া গেলেন? সকল রসের মূলাধার জঠর। সেই মূলাধারকে শান্ত করিতে যাইতেছি।

গৌতম বলিলেন—আর্য, স্নেহই ভালো, যাহার যেখানে স্থান।

যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত শুধাইলেন—মহাকবি, তোমার কাব্যের কি নাম?

কালিদাস বলিল—মেঘদূতম্।

ধনেপাতা

প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা বলিতেছি। কাশ্মীরের অন্তর্গত শ্রীনগর সহরের চকে প্রাতঃকালে প্রাত্যহিক বাজার বসিয়াছে। বড় বড় দোকানগুলি সব রাজপুতদের, মাড়োয়ারীদের, কতক কচ্ছিও আছে; ছোটখাটো দোকানগুলি স্থানীয় লোকদের। চকের চার দিকে দোকানঘর; মাঝখানে ফাঁক, সেখানে দুই দুই সারিতে তরি-তরকারি, ফল-মূল, শাকসব্জির দোকান, এমন অনেকগুলি সারি, মাঝখানে লোক চলাচলের পথ। আর পাহাড়ীরা পাহাড় হ'তে জ্বালানি কাঠ, চাকের মধু, মোম প্রভৃতি আনিয়াছে, বাজারের খাজনা এড়াইবার উদ্দেশ্যে তাহারা একেবারে চকের প্রান্তে বসিয়াছে—সীমানার ঠিক বাহিরেই।

খুব ভোরে বাজার বসে, ভোর হইতেই খরিদ্দার জমিতে থাকে। লোক আসে, কেনে, চলিয়া যায়; আবার লোক আসে, কেনে, চলিয়া যায়—এমনি ভাবে চলিতে থাকে।

আজকের দিনেও বাজারের যেমন দৃশ্য, যেমন হাঁক-ডাক, যেমন জন-জনতা, হাজার বছর আগেও তেমনি ছিল কল্পনা করিয়া লইলে ভুল হইবে না।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন বাজার প্রায় ভাঙে ভাঙে অবস্থা। এমন সময়ে একজন সব্জিওয়ালা পার্শ্ববর্তীকে সভয়ে বলিয়া উঠিল—ভাই দেখো, দেখো।

পার্শ্ববর্তী সে দিকে তাকাইয়া বলিল—তাই তো, ঠক্কুররা আসছে, এইবার ঝগড়া সুরু হ'ল।

তখন দোকানীরা তাড়াতাড়ি দোকানের দরজা বন্ধ করিতে সুরু করিল, যাহারা বাহিরে বসিয়াছে, তাহারা অবিক্রীত জিনিষগুলি এদিকে ওদিকে সরাইয়া রাখিতে লাগিল, ভুক্তভোগী দু-একজন বিক্রয়ের আশা ছাড়িয়া দিয়া

পসরা মাথায় তুলিয়া স্থানত্যাগে উদ্যত হইল। সমস্ত বাজারময় একটা 'রাখ্-রাখ্' 'ঢাক্-ঢাক্' ভাব।

একজন বলবান্ লোক বলিল—আর ভাই সেদিন এক পোড়ো ঠকুর আমার পাঠার বাচ্চাটা এমনি নিয়ে যায় আর কি। আমি চাইলাম ছ'টা পয়সা, দুটো পয়সার বেশী দিলে না।

—দু'ঘা দিয়ে দিলে না কেন?

—ইচ্ছে তো করছিলো, কিন্তু ওদের যে শরীর, ভয় হ'ল, মট ক'রে ভেঙে যাবে!

—যা বলেছ, এদিকে শরীর তো ঐ, কিন্তু সাজের বাহার দেখে মনে হয় রাজপুত্তুর।

—বলে তো তাই! ওরা সবাই নাকি রাজার ছেলে।

—গৌড়ে এত রাজা?

—তা' হলেই বুঝতে পারছো, সে দেশের অবস্থা কেমন? আমরা একটা রাজার ভার সইতে পারি না।

—রাজপুত্তুর, তাতে আর সন্দেহ কি? পড়বার নাম ক'রে এখানে এসে দিন নাই, রাত নাই, পাহাড়ী মেয়েগুলোর সঙ্গে নাগরপনা করা!

—ওদের দেশে কি মেয়ে নেই?

—আরে ভাই, ঐ যে কথায় বলে—'ঘরকা মুরগী ডাল বরাবর।' ওদের মুখে কাশ্মীরী নাশপাতি গৌড়ী আমের চেয়ে অনেক মধুর!

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, ইতিমধ্যে গৌড়ীয় ঠকুরগণ সব্জিওয়ালাদের কাছে আসিয়া পড়িল।

—সংখ্যায় ইহারা আট-দশ জন হইবে।

"এই সকল বিদ্যার্থীদের মুখে পান, পরনে ধুতি, গায়ে উত্তরীয়, বাবরী চুল স্কন্ধে লম্বিত, হাতে ছত্র, নখ লাল রঙে রঞ্জিত; ইহারা ধীরে ধীরে পথ চলে, থাকিয়া থাকিয়া দর্পিত মাথাটি এদিক্-ওদিক্ দোলায়; হাঁটিবার সময়ে ইহাদের ময়ূরপঙ্খী জুতার মচ-মচ শব্দ হয়, মাঝে মাঝে নিজেদের সুবেশ-সুবিন্যস্ত চেহারাটার দিকে তাকাইয়া দেখে; আর কটিতে ইহাদের লাল কটিবন্ধ।"

কয়েকজন ভিক্ষুক ইহাদের পিছনে লাগিয়া গিয়াছে। কোন ভিক্ষুক বলিতেছে "সোনার চাঁদ," কোন ভিক্ষুক বলিতেছে "গৌড়ের রাজা," কোন ভিক্ষুক বা "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" বলিতেছে।

অভিধাগুলি বিদ্যার্থীদের ভালই লাগিতেছে মনে হয়; মাঝে মাঝে দু'একজন মুখ ফিরাইয়া দেখিতেছে, কোনো অভিধা নিজের প্রতি কথিত হইয়াছে মনে করিলে ভিক্ষুককে একটি কড়ি ফেলিয়া দিতেছে।

এক ঠক্কুর অপর জনকে বলিল—নরেন্দ্র, তুমি উহাকে কড়ি দিলে কেন? ও ব্যক্তি "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" আমাকে বলিয়াছে।

নরেন্দ্র বলিল—ধীরেন্দ্র, এ কেমন তোমার আচরণ, ঐ ব্যক্তি আজ দুই বৎসর আমাকে পঞ্চ গৌড়েশ্বর বলিতেছে।

—বুঝিলে কি প্রকারে?

—আমি যে উহাকে চিনি, লোকটা অন্ধ—

—তাই বলো, অন্ধ বলিয়াই বলিয়াছে। নতুবা—

তখন দীনেন্দ্র বলিল—তোমরা প্রকাশ্য বাজারে এরূপ ব্যবহার করিও না, মনে রাখিও, একমাত্র গৌড়বাসিগণই "কৃষ্টিসম্পন্ন"—অন্য কোন দেশের লোকের কৃষ্টি নাই। তাহারা এতদবস্থায় গৌড়বাসীকে দেখিলে কি ভাবিবে?

তখন নরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র একযোগে বলিল—যথার্থ বলিয়াছ! কৃষ্টি রক্ষার্থ আমরা, গৌড়বাসীরা সকল প্রকার সংযম করিতেই পারি, এমন কি, রসনা সংযমও অসম্ভব নহে!

দীনেন্দ্র বলিল—তা ছাড়া বাজার করাও আবশ্যক। সেটাও তুচ্ছ নয়।

—নিশ্চয় নয়, কৃষ্টির সঙ্গে যখন কাঁকুড়ও যুক্ত হয়, তখন তাহার প্রভাব অনস্বীকার্য!

—শুধু কাঁকুড়ই বা কেন? কৃষ্টির সঙ্গে কমলা।

—কৃষ্টির সঙ্গে কদলী।

—কৃষ্টির সঙ্গে কাঁকরোল।

—কৃষ্টির সঙ্গে কয়েৎবেল।

—কৃষ্টির সঙ্গে কচু।

দীনেন্দ্র বলিল—তোমরা কি মুখে মুখেই বাজার শেষ করিবে?

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বাতাসে বেতের লতাসকল যেমন একযোগে দুলিতে থাকে, তেমনি নিজেদের রসিকতার বেগে তাহাদের তনু দেহ তালে তালে এদিক্‌-ওদিক্‌ আন্দোলিত হইতে লাগিল।

একজন সব্জিওয়ালা মৃদুস্বরে বলিল—দেখো ঠক্কুর, ভেঙে না যায়।

আর একজন বলিল—দেহটা গেলে সাধের সাজ-পোশাকগুলোর কি হবে?

একজন ভিক্ষুক বলিয়া উঠিল—"মেনকা বাঈ" "মেনকা বাঈ।"

নিজেকে মেনকা বাঈ বলিয়াছে ভাবিয়া প্রত্যেক ঠক্কুর ভিক্ষুকের উদ্দেশে একটা করিয়া কড়ি ছুঁড়িয়া দিল। মেনকা বাঈ শ্রীনগরের প্রসিদ্ধ নর্তকী।

এবারে সকলের হুঁস হইল। নরেন্দ্র বলিল—ভাই, বাজার যে ভেঙে গেল!

—যাবে না? যত সব পাহাড়ী ভূত ভোর না হতেই এসে হাজির হয়! আমরা তো এক প্রহরের আগে শয্যাত্যাগই করতে পারি না।

—আর করবোই বা কেন? যারা উড়ে, মেড়ো, ছাতু, তারাই ভোরে ওঠে। কৃষ্টিমান্‌দের একটু বিলম্ব হবেই!

—তা তো হবেই, কিন্তু বাজারে যে কিছুই নাই দেখিতেছি।

ইতিমধ্যে তাহারা এ-দোকান ও-দোকান দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। দোকানীরা গৌড়ীয়দের ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত, বলিতেছে—

—ওটা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

—ওটা অমুকে কিনিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

—ওটা পচা।

এমন সময়ে নরেন্দ্র সকলকে তারস্বরে ডাকিল, ও ভাই এদিকে এস, এদিকে এস।

—কি ব্যাপার?

একদল ফড়িঙের ন্যায় ঠক্কুরগণ সে দিকে ছুটিল, কাছে গিয়া দেখিল, কৃষ্টিমান্‌

নরেন্দ্র সেই প্রকাশ্য বাজারে, সহস্র দৃষ্টির সম্মুখে মেনকা বাঈয়ের নৃত্যকে পরাজিত করিয়া নাচিতেছে—তাহার হাতে এক আঁটি শাক—

ধইন্সা পাতা, ধইন্সা পাতা।

সকলে নৃত্যের কারণ বুঝিল, আরও বুঝিল, ইহার চেয়ে নৃত্যের যোগ্যতর কারণ হইতেই পারে না, কাজেই তাহারাও নৃত্যপর নরেন্দ্রকে ঘিরিয়া নাচিতে লাগিল, সকলেরই মুখে 'ধইন্সা পাতা, ধইন্সা পাতা।'

বাজারের লোকে অবাক্। ঠক্কুরদের এমন বিহ্বল অবস্থা তাহারা আগে দেখে নাই। কিন্তু সর্বজ্ঞ হইলে তাহারা বুঝিতে পারিত, যে-কারণে কলম্বাস অকূল সমুদ্রে ভগ্ন বৃক্ষশাখা দেখিয়া উল্লসিত হইয়াছিল, ইহাদের উল্লাসের কারণও তাহা হইতে ভিন্ন নয়। গৌড়বাসীর একটি শ্রেষ্ঠ সুখাদ্য ধনেপাতা। বিদেশে বহুকাল পরে অকস্মাৎ সেই ধনেপাতা আবিষ্কার করিয়া তাহারা যেন স্বদেশকেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। এমন অবস্থায় আত্মবিস্মরণ সম্ভব এবং তাহা মার্জনীয়।

বিহ্বল অবস্থা কাটিলে নরেন্দ্র দোকানীকে শুধাইল—কত দাম ?

বেচারা দোকানী ঠক্কুরদের উল্লাস দেখিয়া দাম চড়াইয়া দিল, বলিল—চার কড়ি।

—চার কড়ি !

—সোনার চাঁদ আর কি ?

—অর্ধেক রাজত্ব।

—তার সঙ্গে রাজকন্যা।

—কিচ্ছু না দিলেই ওর যথার্থ দণ্ড হয় !

—ঠিক, ঠিক, ওকে কিছু দেওয়া নয়—বলিয়া সকলে গৃহাভিমুখে ছুটিল, পিছু পিছু আর সকলেও ছুটিল ; তাহাদের মুখে "ধইন্সা পাতা" "ধইন্সা পাতা" ধ্বনি ; তাহাদের উত্তরীয়, বাবরী, কোঁচা বাতাসে লটপট করিয়া উড়িতে লাগিল, ময়ূরপঙ্খী জুতা আর্তনাদ তুলিল—সবশুদ্ধ মিলিয়া সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

কাশ্মীর হইতে কুমারিকা, প্রভাস হইতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্যন্ত সমস্ত দেশের

লোক রুদ্ধবাক্ অবস্থায় গৌড়ীয় ঠক্কুরগণের দিকে তাকাইয়া রহিল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের কথা সরিল না।

অবশেষে একজন শুধাইল—ক্যাও এ লোক বাওরা হ্যায় !

অপরে বলিল—নেহি নেহি, গৌড়মে সব লোগোকোঁ এহি হাল হ্যায় !

পূর্বোক্ত ব্যক্তি বলিল—অচ্ছী দেশ। বাপ রে ! বাপ !

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—সীয়ারাম। সীয়ারাম।

সব্জিওয়ালা বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে নাগানন্দের চতুষ্পাঠীর দিকে ছুটিল।

২

প্রবাসী গৌড়ীয় ছাত্রাবাসের আবাসিকগণ ইতোমধ্যেই দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া তর্ক বিতর্ক, তর্জন গর্জন করিতে করিতে হঠাৎ একজন আর একজনের পেটে খাগের কলমকাটা চাকু বসাইয়া দিয়াছে।

চাকু মারিয়াছে নরেন্দ্র, চাকু খাইয়াছে ধীরেন্দ্র।

এই ঘটনার পরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আবাসিকগণ কেবলই কোলাহল করিতেছে, পাড়ার লোকে বিচলিত হইবার ভাব দেখায় নাই; কারণ, তাহারা জানে, গৌড়ীয় ছাত্রাবাসে আজ ধনেপাতার শাক আসিয়াছে, আজ অনেক কিছুই ঘটিতে পারে।

নরেন্দ্র ও ধীরেন্দ্র সহপাঠী, সহদেশী, এমন কি, তাহাদের সহগ্রামী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এমন ক্ষেত্রে একজন কেন অপরের পেটে ছুরি মারিল, জানিবার ঔৎসুক্য হওয়াই স্বাভাবিক।

ধনেপাতা লইয়া ছাত্রাবাসে ফিরিলে একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিল, ধনেপাতা কি অবস্থায় খাওয়া হইবে, কাঁচা না তরকারির সহিত রাঁধিয়া ?

নরেন্দ্র বলিল—আমরা চিরকাল কাঁচা খাইতেছি।

ধীরেন্দ্র বলিল—আমার ঠাকুরমা সর্বদা রাঁধিয়া খাইবার পক্ষে।

—তোমার ঠাকুরমা মূর্খ।

—কাঁচা খাওয়াই তোমাদের স্বভাব, তোমরা গরু।

তখন ঠাকুরমার প্রকৃতি ও অপর পক্ষের স্বভাব লইয়া যে সব বিশেষণ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তাহা কেবল গৌড়ীয়গণের মধ্যেই সম্ভব।

ক্রমে সমস্ত ছাত্রই এক এক পক্ষভুক্ত হইয়া গেল এবং উত্তেজনা এমন তীব্রতা পাইল যে, ক্ষণকালের জন্য ধনেশাকের প্রসঙ্গও বিস্মৃত হইল।

তখন দীনেন্দ্র বলিল—ভাই সব, মনে রাখিও, আমরা গৌড়ীয় ছাত্র, সাধারণ উড়ে বা মেড়ো বা ছাতু নই; কাজেই ঝগড়ায় কাজ নাই, ধনেশাক দুই রকমেই প্রস্তুত হোক, যাহার যেমন অভিরুচি খাইবে।

নরেন্দ্র বলিল—এমন হইতেই পারে না, তাহাতে ধনেশাকের অপমান।

ধীরেন্দ্র বলিল—তাহাতে আমার ঠাকুরমার অসম্মান।

আবার কলহ তীব্র হইয়া উঠিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া নরেন্দ্র ধীরেন্দ্রের পেটে ছুরিকাযুক্তি প্রয়োগ করিল।

এই হঠকারিতায় কেহ অপ্রস্তুত হইয়াছে মনে হইল না, এমন কি, ধীরেন্দ্রের ভাবখানাও বিশেষ অসন্তোষজনক নয়, সে যেন মৌন সম্মতির দ্বারা বলিল—গৌড়ীয়দের মধ্যে এমন হইয়াই থাকে।

কিন্তু সমস্যার তো মীমাংসা হইল না। তখন দীনেন্দ্র বলিল—বৃথা কলহে প্রয়োজন কি। এসো, আমরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনের দ্বারা সিদ্ধান্ত করি।

তাহার প্রস্তাবে সকলে সম্মত হইল।

গৌড়দেশে একটি চমৎকার প্রথার প্রচলন আছে। কোন গুরুতর সমস্যার অন্য উপায়ে মীমাংসা না হইলে, সমস্যায় স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইবার রীতি বর্তমান। যে পক্ষে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সংখ্যা অধিক হয়, সেই পক্ষেরই জিত হইয়া থাকে।

কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহাতেও মীমাংসা হইল না, যেহেতু কাঁচা শাক ও রাঁধা শাকের পক্ষে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সংখ্যা সমান সমান হইল। গৌড়ীয় ছাত্রগণ সকলেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—এখন উপায়!

দীনেন্দ্র আবার নূতন প্রস্তাব করিল, সে বলিল—ভাই, কাঁচাও থাক, রাঁধাও থাক, এসো—আজ আমরা নাসাভোজন করি, ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—আজ ধনে শাকের গন্ধ শুঁকিয়াই ক্ষান্ত হই।

তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে গৌড়ীয়গণ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়াই এমন এক বিকট জয়োল্লাস করিল যে, পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ক্যা হুয়া ?

গৌড়ীয় ছাত্রগণ বলিল—আরে শিয়ালকা মাফিক্ 'হুয়ো হুয়ো' মৎ করো।

গৌড়ীয় ছাত্রগণ অন্যান্য দেশের লোকের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন দুর্বলতা বলিয়া মনে করে। বিশেষ তাহাদের ধারণা এই যে, যাহারা গৌড়ীয় ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করাই প্রকৃত মনুষ্যত্বের লক্ষণ।

শেষ পর্যন্ত নাসাভোজন করাই স্থির হইল। মাঝখানে ধনেশাকের আঁটি ঝুলাইয়া রাখিয়া সকলে যথেচ্ছ শুঁকিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং সে দিনের মতো ধনে শাকের প্রসঙ্গ ঐখানেই মিটিয়া গেল।

৬

শ্রীনগরে অবস্থিত নাগানন্দ স্বামীর চতুষ্পাঠী একটি ভারতবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। এখানে ভারতের সকল অঞ্চল হইতে বিদ্যার্থী আসিয়া থাকে, গৌড় হইতেও আসে। গৌড়ীয় বিদ্যার্থীরা অধ্যয়নে যেমন পশ্চাৎপদ, নিজেদের ও অন্য দেশের ছাত্রের সঙ্গে কলহে ও দুর্ব্যবহারে তেমনি তাহারা অগ্রণী। অন্য অঞ্চলের ছাত্ররা পরস্পরের ভাষা শেখে, গৌড়ীয়গণ অন্য কোন অঞ্চলের ভাষা শিখিবে না, অন্য কাহারও সঙ্গে মিশিবে না, নিজেদের মধ্যে জটলা করে, নিজেদের ছাত্রাবাসের নাম দিয়াছে 'প্রবাসী গৌড়ীয় ছাত্রাবাস,' অন্য অঞ্চলের ছাত্রগণ শুধু অঞ্চলটির নামটি উল্লেখ করাই যথেষ্ট বোধ করে, এক কথায়, শ্রীনগর সহরে তাহারা ক্ষুদ্র একটি গৌড়দেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে বলে,

সমানে সমানে মিল হয়, গৌড় ও অন্যান্য অঞ্চলে শিক্ষা-দীক্ষার এমন তারতম্য, মিলনের ক্ষেত্র কোথায় ?

বৃদ্ধ নাগানন্দ স্বামী পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও চরিত্রের জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয়, কেবল গৌড়ীয় ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাপরায়ণ নহে, গৌড়ীয়গণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিয়া থাকে, লোকটা পণ্ডিত সন্দেহ নাই, কিন্তু গৌড়ের সীমার বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াই সব মাটি করিয়া ফেলিয়াছে।

ধনেশাক প্রসঙ্গের পরদিন নাগানন্দ স্বামীর চতুষ্পাঠী বসিয়াছে।

নাগানন্দ স্বামী বলিলেন—গৌড়ীয় ছাত্রদের যে দেখিতেছি না।

একটি মারাঠী ছাত্র বলিল—আচার্য, তাহারা তো সময়মতো কখনই আসে না।

নাগানন্দ স্বামী বলিলেন—ওটি তাহাদের একটি মহৎ দোষ।

তারপরে বলিলেন, কাল বাজারে কি ঘটিয়াছিল, তোমরা কেহ দেখিয়াছ ?

মারাঠী ছাত্রটি বলিল—ঐ যে তাহারা আসিতেছে। একেবারে তাহাদেরই শুধাইবেন। আমরা কি বলিতে কি বলিব, গৌড়ীয় ছাত্রগণ বড় পরমত-অসহিষ্ণু।

এমন সময় গৌড়ীয় ছাত্রগণ প্রবেশ করিল।

অন্য দেশের ছাত্রগণ প্রথমে আচার্যের পাদবন্দনা করিয়া নিজেদের মধ্যে কুশল সম্ভাষণ করিয়া, তবে আসন গ্রহণ করে, ইহারা সেরূপ কিছুই করিল না। আচার্যের দিকে মাথা দিয়া একটা ঢুঁ মারিবার ভঙ্গী করিয়া সকলে একান্তে বসিয়া পড়িল এবং অনতিনিম্নস্বরে কথাবার্তা বলিতে সুরু করিল।

আচার্য বলিলেন, কাল তোমরা বাজারে কি করিয়াছিলে ? একজন দরিদ্র সব্জিওয়ালা আমার কাছে অভিযোগ করিয়া গিয়াছে।

নরেন্দ্র বলিল—আপনার কাছে দর্শন পড়িতে আসিয়াছি, পড়ান, ওসব ব্যাপারের মধ্যে আপনি যান কেন ?

আচার্য। আমি আর গেলাম কই ! দায়ে পড়িয়া সে লোকটা আমার কাছে আসিয়াছিল।

নরেন্দ্র। আপনি রাজা না কোটাল! আপনার কাছে আসে কেন?

আচার্য। তোমাদের গৌড়দেশের রীতি কি জানি না। অন্ত সর্বত্র আচার্যের স্থান—রাজা ও কোটালের উপরে। একথা নিতান্ত অশিক্ষিতেও জানে, তাই রাজদ্বারে না গিয়া আমার কাছে আসিয়াছিল।

নরেন্দ্র। আপনি আমাদের দেশ তুলিয়া কথা বলিবেন না।

আচার্য। তোমাদের আচরণেই যে তোলায়, অন্যান্য দেশের ছাত্রগণের সঙ্গে তোমাদের প্রভেদ কি বুঝিতে পারো না?

নরেন্দ্র। ওরা ছাতু খায়, ভুট্টা খায়, জোয়ার খায়, চানা খায়, পুঁদিনার শাক খায়।

আচার্য। তাহাতে ক্ষতি কি? যাহার যা খাদ্য।

নরেন্দ্র। ক্ষতি এই যে, ওরা উড়ে, মেড়ো, ছাতু, ভূত।

এমন সময়ে একটি গুজরাটি ছাত্র বলিল, তোমরা যে ধনেপাতা খাও।

ধীরেন্দ্র। আমাদের খাদ্য তুলিয়া কথা বলিও না।

আচার্য। তোমরা অনেক বেশি তুলিয়াছ।

ধীরেন্দ্র। আপনি উহাদের দিকে টানিয়া বলিলেন।

আচার্য। তোমাদের দিকে ঘেঁষিতে দাও কই?

সেই গুজরাটি ছাত্রটি বলিল—যাহারা তুচ্ছ ধনেশাকের জন্য পরস্পরের পেটে ছুরি মারিতে পারে—

ধীরেন্দ্র। কে বলিল ছুরি মারিয়াছে?

গুজরাটি ছাত্র। তোমার পেটে ও পটি বাঁধা কেন?

ধীরেন্দ্র। তোমার পেটে তো বাঁধিতে যাই নি, তোমার ক্ষতি কি?

আচার্য। এখন বিতণ্ডা থাক্। সব্জিওয়ালা দাম পায় নাই, দুটা কড়ি চাহিতেছিল, দিয়া দিয়ো।

নরেন্দ্র। ওর প্রতি আপনার এত দরদ কেন? কিছু ভাগবখরা হইয়াছে বুঝি!

তাহার বাক্যে গৌড়ীয়গণ ছাড়া আর সকলেই অস্তস্তব্ধ হইয়া গেল।

আচার্যের সম্বন্ধে এমন কথা! যাঁহার সম্মুখে স্বয়ং কাশ্মীররাজ আসন গ্রহণ করেন না।

আচার্যের অপমানে অন্যান্য ছাত্রগণ এবারে গর্জন করিয়া উঠিয়া বলিল—এখনি আচার্যের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করো।

গৌড়ীয় ছাত্রগণ স্প্রিংএর পুতুলের মতো লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—কখনোই নয়, কখনোই নয়, প্রাণ থাকিতে নয়।

সরু সরু লিকলিকে কেঁচো যেমন কুণ্ডলীকৃত অঙ্গভঙ্গী করে, শীর্ণকায় গৌড়ীয় ছাত্রগণের কঙ্কালসার দেহ তেমনি পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে লাগিল! 'ইস্', আমাদের এমন অপমান! থাকিত আজ গৌড়রাজের সৈন্য।'

আচার্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, গৌড়ীয়দের প্রতি বলিলেন, আচরণ সংশোধন করিবার পরে তোমরা এখানে আসিও, আজ বিদায় হও।

গৌড়ীয়গণ চীৎকার করিতে লাগিল—দেখিব, তুমি কেমন ফলনা আচার্য, দেখিব, তুমি কেমন চতুষ্পাঠী করো, সব ভাঙিয়া দিব! আমাদের এখনো তুমি চিনিতে পারো নাই, এবারে পারিবে, পারিয়া নাকের জলে চোখের জলে এক হইবে, ইত্যাদি।

৪

পরদিন প্রাতঃকালে নাগানন্দ স্বামী তাঁহার কুটীরের দ্বার খুলিয়াই দেখেন যে, গৌড়ীয় বিদ্যার্থিগণ ঠিক দরজার সম্মুখেই সারি বাঁধিয়া শুইয়া আছে, পা ফেলিবার জায়গা নাই।

তিনি শুধাইলেন—বাপু, তোমরা এখানে এভাবে শুইয়া পড়িলে কেন?

একজন বলিল—আমরা প্রায়োপবেশন করিতেছি।

নাগানন্দ। প্রায় উপবেশন আর কোথায়? ইহাকে তো শয্যাগ্রহণ বলে।

গৌড়ীয় বিদ্যার্থী। ইহাই প্রায়োপবেশনের রীতি।

নাগানন্দ। আচ্ছা, না হয় তাহাই হইল; কিন্তু কাশ্মীর রাজ্যে কি আর স্থান ছিল না? আমার দরজার সম্মুখে কেন? বাহির হইব কি উপায়ে?

—আমাদের বুকের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাও।

নাগানন্দ। তোমাদের যে পাখীর বুক, মচ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু বাপু, প্রায়োপবেশনের উদ্দেশ্য কি ?

—আপনার মত পরিবর্তন করাইতে চাই।

নাগানন্দ। আমার অপরাধ কি ?

—কাল আপনি আমাদের অপমান করিয়াছেন।

নাগানন্দ। লোকের ধারণা তো ঠিক অন্তরূপ, তোমরাই আচার্যের সঙ্গে অনার্যোচিত ব্যবহার করিয়াছ।

—আবার অপমান করিলেন। আমাদের অনার্য বলিলেন।

নাগানন্দ। বলিলে অন্যায় হয় না, কিন্তু সত্যই কি বলিয়াছি ?

— সে লোকে বিচার করিবে। এই আমরা শুইয়া রহিলাম, আপনি যা পারেন করুন।

অগত্যা নাগানন্দ স্বামী ঘরের মধ্যেই রহিতে বাধ্য হইলেন। অধিকাংশ বিদ্যার্থী শুইয়া রহিল, কেবল জনতুই একটা জগঝম্প পিটিয়া লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভিড় জমিয়া গেল।

সকলে অবাক্। এমন দৃশ্য তাহারা কখনো দেখে নাই। সকাল গেল, তুপুর গেল, সায়াহ্ন আসিল, না উঠিল বিদ্যার্থিগণ, না থামিল জগঝম্পের বাজনা।

ভিড়ের মধ্য হইতে একজন বলিল—তোমরা কি স্নানাহার করিবে না ?

—না।

—তোমরা কি আচার্যকে বাহিরে আসিতে দিবে না ?

—তিনি স্বচ্ছন্দে বাহিরে আসিতে পারেন, আমরা আটকাই নাই।

—ইহাকেই তো আটকানো বলে।

—মোটেই নয়, ইহাকে বলে সাত্ত্বিক প্রায়োপবেশন।

—কিন্তু আচার্যও যে প্রায়োপবেশন করিতে বাধ্য হইতেছেন।

—আমরা তাহার কি করিব ?

রাত্রি আসিল। ভিড় কমিয়া গেল। কিন্তু প্রায়োপবেশকাল উঠিল না, বাজনাও থামিল না। নাগানন্দ ঘরের মধ্যে বন্ধ রহিলেন, কিন্তু অভুক্ত রহিলেন না। তিনি যোগী পুরুষ, যোগবলে ঘরে বসিয়াই খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আহার করিলেন। অভুক্ত বিদ্যার্থীদের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার দুঃখ হইল, ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, যোগবলেও জীবনের সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। তিনি আধুনিক কালের লোক হইলে নিরম্বু উপবাস করিতে বাধ্য হইতেন।

এই ভাবে তিন চার দিন গেল। প্রতিদিনই ভিড় বাড়িতে লাগিল। সকলে দেখিয়া অবাক্ হইল যে, বিদ্যার্থিগণ আজ চার দিন অভুক্ত, অথচ দিব্য প্রফুল্লমূর্তি, মুখে ক্লেশ বা অনশনের চিহ্নমাত্র নাই।

কেহ বলিল—উহারা মায়া জানে।

কেহ বলিল—উহারা যোগী।

কেহ বলিল—ক্ষুধাতৃষ্ণা জয় করিবার কৌশল শিখিবার উদ্দেশ্যে একবার গৌড়ে যাইতে হইবে দেখিতেছি।

অবশেষে ব্যাপারটা রাজার কানে পৌছিল। তিনি মন্ত্রীকে দিয়া উপবাস ভঙ্গ করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। বিদ্যার্থীরা সম্মত হইল না। অবশেষে রাজা কোটালকে আদেশ করিলেন, সৈন্য দিয়া ছাত্রদের যেন ঘিরিয়া রাখে, নতুবা লোকে তাহাদের বিরক্ত করিতে পারে।

এই আদেশ শুনিয়া বিদ্যার্থীরা ঘোরতর আপত্তি করিল, বলিল—তাহা হইলে রাজদ্বারেও প্রায়োপবেশন সুরু করিতে হইবে দেখিতেছি।

রাজা বলিলেন—থাক, বাদ দাও, উহাদের ভালোর জন্যই ঘিরিয়া রাখিবার কথা বলিয়াছিলাম, উহারা না চায়, নাই ঘিরিয়া রাখিলে, আমার কি শিরঃপীড়া!

আরও চার পাঁচ দিন গত হইল। রাজা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, একটা অঘটন ঘটিয়া গেলে গৌড়েশ্বর কি বলিবেন। তিনি রাজবৈদ্যকে পাঠাইয়া দিলেন, বলিলেন,—যাও, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ, ছাত্রদের শরীরের অবস্থা কিরূপ?

বিদ্যার্থীরা রাজবৈদ্যকে কাছে ঘেঁষিতে দিল না।

রাজা প্রধান অমাত্যগণকে পাঠাইয়া দিলেন, একবার কহিয়া দেখো, অনশন ত্যাগ করে কি না!

বিদ্যার্থীরা কাহারো কথা শুনিল না, বরঞ্চ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, আগে নাগানন্দ মত পরিবর্তন করুক, তারপরে আমাদের অনুরোধ করিও।

অমাত্যগণের মুখ ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কালো হইয়া গেল, তাহারা ভাবিতে লাগিল, রাজাকে গিয়া কি বলিবে।

এমন সময় এক বুড়ো মিঠাইওয়ালা তাহাদের কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—কর্তা, আপনারা ছাত্রদের জন্য চিন্তা করিবেন না, তাহারা কদাচ অনাহারে মরিবে না।

একজন কৌতূহলী হইয়া শুধাইল, কেন এমন বলিতেছ?

কিন্তু মিঠাইওয়ালাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না, ভিড়ের মধ্যে সে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে।

আরও চার দিন গেল। বিদ্যার্থীদের প্রায়োপবেশনের আজ পঞ্চদশতম দিবস।

গৌড়বাসীর অনশনক্ষমতায় সমস্ত কাশ্মীর হতবুদ্ধি।

একজন বলিল—অনশনেই ওরা অভ্যস্ত, তাই না ওরূপ চেহারা।

আর একজন বলিল—মনের বলই বল, শরীরটা তো তুচ্ছ, শিক্ষা না থাকিলে নয়, তাই আছে।

অপর আর একজন বলিল—যা বল, ওরাই আসল ব্রাহ্মণ, সংস্কৃত উচ্চারণ যেমনি করুক না কেন।

ক্রমে অনেক লোকেই বিদ্যার্থীদের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ হইয়া উঠিল, তাহারা বিদ্যার্থীদের অপরাধ ভুলিয়া গেল, এমন কি, কেহ কেহ নাগানন্দকেই দোষী সাব্যস্ত করিতে লাগিল। জনমত যখন বিদ্যার্থীদের দিকে ঘুরিবার মুখে, এমন সময়ে এক অঘটন ঘটিল।

সে দিন অনশনের ষোড়শতম দিবস। দুইজন গৌড়ীয় বিদ্যার্থী (সেই [illegible]

জনমত জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে জগঝম্প পিটিত) অতি প্রত্যুষে ছুটিতে ছুটিতে রাজবৈদ্যের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজবৈদ্য শুধাইল—এত ভোরে! কি সংবাদ?

—আপনাকে একবার যাইতে হইবে।

—কোথায়?

—প্রায়োপবেশন ক্ষেত্রে।

—সঙ্কট দেখা দিয়াছে বুঝি! আগেই জানিতাম, এমন হইবে। হিক্কা, না শ্বাস, না দুই-ই?

—আজ্ঞে, দুই-ই।

—হিক্কা আর শ্বাস?

—আজ্ঞে, না, ভেদ আর বমি।

—উদরাময়?

—তাইতো মনে হইতেছে।

—কি আশ্চর্য! প্রায়োপবেশনের ফলে উদরাময়, এমন তো শাস্ত্রে লেখে না।

—আজ্ঞে তবু সত্য, কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

—কেন এমন হইল বলিতে পারো?

—আজ্ঞে, ঘৃতটা কিঞ্চিৎ নীরেস ছিল।

—ঘৃত? এর মধ্যে ঘৃত কোথা হইতে আসিল?

—এক বেটা বুড়ো মিঠাইওয়ালার অনবধানেই এমন ঘটিয়াছে।

—মিঠাইওয়ালা? তোমরা কি তবে প্রায়োপবেশন কর নাই?

—আজ্ঞে প্রায় উপবেশন করিয়াছিলাম বলিয়াই এমন দুরবস্থা ঘটিল, শুধু উপবেশন করিলে বোধ করি এমন হইত না।

তারপরে রাজবৈদ্যের চিকিৎসার গুণে উদরাময়ের রোগীরা কয়েক দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিল, আর নাগানন্দ স্বামীও গৃহাবরোধ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

অতঃপর কাশ্মীররাজ গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে বলিলেন—বৎস, এবার তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও।

বিদ্যার্থীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া বলিল—আমাদের পাথেয়ের অভাব।

রাজা বলিলেন—রাজকোষ হইতে দিতেছি।

বিদ্যার্থীরা বলিল—সঙ্গীর অভাব।

রাজা বলিলেন—কয়েকজন সৈন্য তোমাদের সঙ্গে গৌড় পর্যন্ত যাইবে।

তখন বিদ্যার্থীরা বলিল—আমরা যে চতুষ্পাঠীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, এমন অভিজ্ঞানপত্র দিতে হইবে।

রাজা বলিলেন—তাহাও দিতে পারি। কিন্তু তোমরাই জানো, কত দুর কি শিখিয়াছ, দেশে গিয়া ধরা পড়িবে না ?

বিদ্যার্থীরা বলিল—আজ্ঞে, সে আশঙ্কা নাই ; কারণ, দেশের লোকেরা আমাদের চেয়েও মূর্খ !

রাজা বলিলেন—তবে তাহাই হোক্। তোমাদের অভীষ্ট সব বস্তুই পাইবে, এখন যাও, প্রস্তুত হও গিয়া।

তারপর একদিন সুপ্রভাতে গৌড়ীয় বিদ্যার্থিগণ রাজব্যয়ে কাশ্মীর ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। চারিদিকের জনতাকে অভিভূত করিয়া দিয়া বিদ্যার্থিগণ 'কাশ্মীর নিপাত যাউক' ধ্বনি করিতে লাগিল এবং পালাক্রমে 'কাশ্মীর নিপাত যাউক' ও 'গৌড় উন্নত হউক' ধ্বনি তুলিতে তুলিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

তাহারা চলিয়া গেলে, বিস্ময়ের ভাব কতকটা কাটিলে একজন বলিয়া উঠিল—'দুনিয়া তো এক আজব চিড়িয়াখানা হ্যায়। ঔর গৌড় উসীমে বন্দরকা মোকাম ! সীয়ারাম, সীয়ারাম।'

পরিশিষ্ট

বাঙালী-নিন্দুক বলিয়া বর্তমান লেখকের একটা দুর্নাম আছে। এই গল্পটি তাহারই দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য হইবে আশঙ্কা। কাজেই যে উৎস হইতে গল্পটির

উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। উক্ত অংশ পড়িলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, হাজার বছর আগেও বাঙালী-চরিত্র একই রকম ছিল, তাহার নিন্দা করিবার জন্য কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন, নির্জলা সত্যকথনই যথেষ্ট, আর যিনি এ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তিনিও বাঙালী ছিলেন না। কাজেই বিবরণটিকে ও বর্তমান গল্পটিকে নিরপেক্ষ চিত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কাশ্মীরে গৌড়ীয় বিদ্যার্থী

কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার দশোপদেশ-গ্রন্থে কাশ্মীর-প্রবাসী গৌড়ীয় বিদ্যার্থীদের বর্ণনা দিয়াছেন। দশম একাদশ শতকে প্রচুর গৌড়ীয় বিদ্যার্থী কাশ্মীরে যাইতেন বিদ্যালাভের জন্য। ক্ষেমেন্দ্র বলিতেছেন, ইঁহারা ছিলেন অত্যন্ত ছুৎমার্গী, ইঁহাদের দেহ ক্ষীণ, কঙ্কালমাত্র সার এবং একটু ধাক্কা লাগিলেই ভাঙ্গিয়া পড়িবেন, এই আশংকায় সকলেই ইঁহাদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। কিন্তু কিছুদিন প্রবাস-যাপনের পরই কাশ্মীরের জল-হাওয়ায় ইঁহারা বেশ মেদ ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেন। 'ওঙ্কার' ও 'স্বস্তি' উচ্চারণ যদিও ছিল ইঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত কঠিন কর্ম, তবু পাতঞ্জলভাষ্য, তর্কমীমাংসা প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রই তাঁহাদের পড়া চাই।···ক্ষেমেন্দ্র আরও বলিতেছেন, গৌড়ীয় বিদ্যার্থীরা ধীরে ধীরে পথ চলেন এবং থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাদের দর্পিত মাথাটি এদিক্-সেদিক্ দোলান। হাঁটিবার সময় বিদ্যার্থীর ময়ূরপঙ্খী জুতায় মচ্‌মচ্ শব্দ হয়; মাঝে মাঝে তিনি তাঁহার সুবেশ সুবিন্যস্ত চেহারাটার দিকে তাকাইয়া দেখেন। তাঁহার ক্ষীণ কটিতে লাল কটিবন্ধ। তাঁহার নিকট হইতে অর্থ আদায় করিবার জন্য ভিক্ষুক এবং অন্যান্য পরাশ্রয়ী লোকেরা তাঁহার তোষামোদ করিয়া গান গায় ও ছড়া বাঁধে। কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেত দন্তপংক্তিতে তাঁহাকে দেখায় যেন বানরটি। তাঁহার দুই কর্ণলতিকায় তিন তিনটি স্বর্ণকর্ণভূষণ, হাতে যষ্টি, দেখিয়া মনে হয়, যেন সাক্ষাৎ কুবের। স্বল্পমাত্র অজুহাতেই তিনি রোষে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন, সাধারণ একটু কলহে ক্ষিপ্ত হইয়া ছুরিকাঘাতে নিজের সহ-আবাসিকের পেট

চিরিয়া দিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন না। গর্ব করিয়া তিনি নিজের পরিচয় দেন ঠক্কুর বা ঠাকুর বলিয়া এবং কম দাম দিয়া বেশি জিনিষ দাবি করিয়া দোকানদারদের উত্যক্ত করেন। (বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃঃ ৫৫১—৫৫২, নীহাররঞ্জন রায়।)

গুরুমারা চেলা

স্থলতান সারিবদ্ধ বন্দীদের দেখিয়া বলিলেন—না, এতগুলো লোককে কিছুতেই হত্যা করা চলে না।

কোটাল করজোড়ে বলিল—জাঁহাপনা এই দুর্বৃত্তেরা যত লোককে হত্যা করিয়াছে, যত লুণ্ঠন, যত গৃহদাহ করিয়াছে, জানিলে ইহাদের প্রতি আপনার দয়া হইত না।

স্থলতান বলিলেন—তোমার বাক্য আমি বিশ্বাস করিতেছি, কিন্তু মৃত্যু ছাড়া আর কি যোগ্য দণ্ড নাই ?

তার পরে বন্দীদের দেখাইয়া বলিলেন—দেখো, কেমন স্থগঠিত স্থস্থ দেহ, এগুলি সমাজের সম্পদ্ নয় ? ব্যভিচার ঘটিয়াছে বলিয়াই কি ব্যবহার ভুলিতে হইবে ?

অমাত্য বলিল—জাঁহাপনা, কোটাল সাহেব কেবল হত্যার তালিকাই দিলেন, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা এই যে, এই রাজ্যে যে-সব জালজুয়াচুরি, মিথ্যা মামলা, শঠতা প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে, সে সমস্তেরও মূলে ইহারাই। অতএব আমার আরজি এই যে, ইহারা শাসিত না হইলে রাজ্যরক্ষা করা কঠিন হইবে।

স্থলতান জালাল উদ্দিন খিলজি বলিলেন—তোমাদের উভয়ের কথাই সত্য, কিন্তু ইহাদের আচরণের জন্ত দায়ী ইহাদের স্বভাব। হতভাগ্যেরা যেমন শিখিয়াছে, তেমন করে—মারিয়া ফেলিলে তো স্বভাব সংশোধন হইবে না ? তা ছাড়া দেখো—ইহাদের মধ্যে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে ; হিন্দু বধ করিলে আমার হিন্দু প্রজাগণ দুষিবে, মুসলমান বধ করিলে মুসলমান প্রজাগণ দুষিবে—আর উভয় সম্প্রদায়কে বধ করিলে উভয় সম্প্রদায় দুষিবে। এ অবস্থায় মৃত্যুদণ্ড দান সম্ভব নহে।

—তবে জাঁহাপনার কি আদেশ ?

—রাজ্যের উপরে ইহাদের প্রভাব অবাঞ্ছিত স্বীকার করিতেছি। কাজেই নির্বাসন দণ্ডই সমুচিত বিধান।

—কিন্তু শাহেনশাহ, যেখানে নির্বাসনে পাঠাইবেন, সেখানে গিয়া কি ইহারা স্বভাব বদলাইবে? তা' যদি না বদলায়, তবে সেখানকার লোকের অবস্থা কি হইবে একবার ভাবিয়া দেখুন।

—সে কথা সত্য! তাই তো রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমায় পাঠাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছি। সে দেশ জনবিরল, সেখানে কাহার স্বভাব ইহারা পরিবর্তন করিবে?

—কোন্ প্রত্যন্ত সীমায়?

—পূর্ব দেশে। সেখানে গৌড় নামে যে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পূর্ণ দেশ আছে, তাহার প্রধান নগর লখ্‌নৌতি। আমার আদেশ এই যে, ইহাদের সপরিবারে সেখানে পৌছাইয়া দাও। সেখানে ইহারা স্বচ্ছন্দে বসবাস করুক। তাহাতে ইহারাও প্রাণে মরিবে না, দিল্লীর লোকও প্রাণে বাঁচিয়া যাইবে

—আর লখ্‌নৌতির লোক?

—জলে জল মিশিয়া যাইবে, কেহ প্রভেদ বুঝিতে পারিবে না। গৌড়ের প্রভাব দিল্লীতে পৌছিতে পারিবে না।

সুলতানের আদেশ অমান্য করিবার উপায় নাই—অতএব সেই হাজার ঠগকে সপরিবারে গৌড়ে পৌছাইয়া দেওয়াই স্থির হইল। তখন তাহারা সরকারী পাহারায় নৌকাযোগে দিল্লী হইতে যমুনা, গঙ্গা এবং মহানন্দার স্রোত বহিয়া একদিন প্রাতঃকালে সত্য সত্যই লখ্‌নৌতিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে তাহারা নামিলে কোটাল বলিল, তোমরা এখানে স্বাধীনভাবে বাস করো, কিন্তু সাবধান, দিল্লীতে ফিরিবার চেষ্টা করিও না। সেখানে ফিরিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, ইহাই সুলতানের আদেশ।

এই বলিয়া কোটাল ঠগদের মুক্তি দিল এবং কিছুদিন পর্যন্ত তাহাদের নজরবন্দী করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে এক দল সৈন্য রাখিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিল।

২

দেশের শ্রী দেখিয়া ঠগের দল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হায় হায়, তাহারা এ কোথায় আসিয়া পড়িল! এ কি একটা জনপদ, এ কি মানুষের আবাস, আর এখানে যে-সব দ্বিপদ জীব ঘোরা-ফিরা করিতেছে, তাহারা কি মানুষ? কোথায় নগরীশ্রেষ্ঠ দিল্লী, জীবশ্রেষ্ঠ দিল্লীবাসিগণ, কোথায় তাহাদের সে ঐশ্বর্য! কোথায় সেই দিল্লীর চাঁদনী চক, অহোরাত্র লোকসমাগমে গম্‌গম্ করে, তাহাদের শিল্পচর্চার সে কি অবাধ অবসর! তাহার তুলনায় এ কি একটা স্থান! একই দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত! মুসলমান ঠগেরা আল্লা আল্লা করিয়া, হিন্দু ঠগেরা হায় ভগবান্ করিয়া কপাল চাপড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাহারা ফৌজদারের পায়ে গিয়া পড়িল, বলিল—সাহেব, আমাদের দিল্লী লইয়া চলো।

ফৌজদার সিদ্ধির পাত্রে চুমুক দিতে দিতে বলিল—সেখানে গেলে তোমাদের মৃত্যুদণ্ড অবধারিত।

ঠগেরা বলিল—চাঁদনী চকে গিয়া যে মৃত্যু, তাহা এখানে বাঁচিয়া থাকিবার চেয়েও অনেক ভালো।

ফৌজদার বলিল - কিন্তু লইয়া গেলে আমারও মৃত্যুদণ্ড হইবে।

ঠগেরা বলিল—সাহেব, পরোপকারের উদ্দেশ্যে না হয় প্রাণটা দিলেই।

কিন্তু ফৌজদারের কথাবার্তায় বোঝা গেল, এ বিষয়ে ঠগদের সঙ্গে তাহার গুরুতর মতভেদ আছে।

সে বলিল—তা হইবার নয়, তোমাদের এখানেই থাকিতে হইবে। তোমরা যাহাতে ফিরিতে না পারো, তাহা দেখিবার জন্যই আমি আছি।

তারপরে বলিল—দুঃখ করিও না, মনীষিগণ প্রতিকূল অবস্থায় মুহ্যমান হয় না, তোমাদের মনীষা সর্বজনস্বীকৃত, তোমরা কেন ম্রিয়মাণ হইতেছ? এখানেও মানুষ আছে—কাজেই তোমাদের শিল্পচর্চা একেবারে ব্যাহত হইবে, সেরূপ

আশঙ্কা করিও না। চারি দিকে ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখ—প্রতিভার পথ সর্বত্র উন্মুক্ত।

ঠগেরা হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

ঠগদের সর্দ্দার রাম কাহেলী। সে বলিল—তোমরা নিরুৎসাহ হইয়া ভাবিও না যে, ভগবান্ আমাদের প্রতিকূল। এরূপ ভাবিলে ভগবানের প্রতি অবিচার করা হইবে। সাধারণ লোকেরা ঐরূপ ভাবিয়া থাকে। আবার তোমরাও যদি সেই চিন্তাধারাকে গ্রহণ করো, তবে ভগবান্ দাঁড়াইবেন কোথায়? সাধারণ লোকে যাহাই ভাবে ভাবুক, আমার ধারণা এই যে, ভগবান্ বিশেষ ভাবে ঠগ-সমাজের দিকেই। প্রমাণ চাও? প্রতিদিন যে শত শত ঠগ স্বকার্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের মধ্যে কয়জন ধরা পড়ে? যে-কয়জন হতভাগা ধরা পড়ে, তাহা ভগবানের নির্দেশে নয়, তাহাদের শিল্পচাতুরীর অভাবে। আবার দেখো—সাধারণ মানুষ নিত্যনিয়মিত ঠগের হাতে মারা পড়িতেছে, কই—ভগবান্ তাহাদের রক্ষা করেন না কেন? তিনি তো সর্বশক্তিমান্, ইচ্ছা করিলেই পারেন, তবে যে করেন না, তাহার আসল কারণ, রক্ষা করা তাঁহার ইচ্ছা নয়। আর প্রমাণের বাকি রহিল কি? অতএব ভাই সকল, ভগ্নহৃদয় হইবার প্রয়োজন নাই, আবার ভগবদিচ্ছায় আমরা প্রতিষ্ঠা লাভ করিব। হয় তো মঙ্গলময়ের ইহাই অভিপ্রায় যে, এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে ঠগায়ন প্রচারিত হইবে। কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে, অতএব এসো, ক্লৈব্য ত্যাগ করিয়া সকলে বদ্ধপরিকর হও।

রাম কাহেলী গীতাখানি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছে বুঝিতে পারা যায়! কোন্ ঠগ না ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়া থাকে!

সর্দারের বক্তৃতায় ঠগেরা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—সর্দার, এবার কি করিতে হইবে আদেশ করো।

রাম কাহেলী বলিল—তোমাদের মধ্যে তিন জন পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যাও, আমি স্বয়ং পূব দিকে যাইব। এই স্থানটা একবার তন্ন তন্ন করিয়া দেখা দরকার। তার পরে আমরা কর্মপদ্ধতি স্থির করিব। কারণ, শাস্ত্রেই বলিয়াছে যে, আগে জ্ঞান, পরে কর্ম। তখন তিন জন অভিজ্ঞ ঠগ তিন দিকে

রওনা হইল, আর খোদ সর্দার চলিল পূব দিকে। সেই দিকেই বাজার ও জনপদ আছে বলিয়া তাহারা শুনিয়াছিল। স্থির হইল যে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা সকলকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা নিবেদন করিবে।

৩

সন্ধ্যাবেলায় চার জন ঠগ চার দিক্ হইতে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের ঘিরিয়া সকলে বসিল।

তখন রাম কাহেলী বলিল—বিঠোবা, তুমি পশ্চিম দিকে কি দেখিলে বলো?

বিঠোবা আরম্ভ করিল—সর্দার, কি আর দেখিব! এমন দেশে মানুষ আসে! পশ্চিম দিকে আমি পাঁচ ছয় ক্রোশ গিয়াছিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না, না একটা মানুষ, না একটা ঘরবাড়ী! শেষে একটা বিলের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। তখন একটা বুনো শূওর তাড়া করিল। তাড়াতাড়ি পালাইয়া আসিলাম!

সর্দার তাহার অভিজ্ঞতা শুনিয়া বলিয়া উঠিল—আরে রাম কহো! রাম কহো! তার পরে বলিল—রহমৎ, তুমি দক্ষিণ দিকের কথা বলো।

রহমৎ শুরু করিল—সর্দার, আমি অনেকক্ষণ চলিয়া সেখানে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ভাবিলাম, এবারে ফিরি। ফিরিবার পথে দেখিলাম, একটা গোরু চরিতেছে। মনে করিলাম, গোরুটাকে লইয়া যাই। গোরুটার গলা ধরিয়া টানিবা মাত্র সে নিতান্ত ভাল ছেলেটির মতো আমার সঙ্গে চলিতে লাগিল। সর্দার—ভাবিলাম, ওটা সত্য সত্যই গোরু! একবার চিন্তা করিয়া দেখো, দিল্লীর গোরু হইলে কি করিত! টানাটানি করিয়া, ঢুঁ মারিয়া প্রাণান্ত করিত। তখন মনে হইল—আল্লা, এ কোন্ দেশে আনিলে? চুরি, রাহাজানি যে করিব, তাহার সুযোগ পর্যন্ত নাই—তাই জানোয়ারটাকে ছাড়িয়া দিয়া একাই চলিয়া আসিলাম।

সকলে তাহার অভিজ্ঞতা শুনিয়া তাজ্জব বনিয়া গেল।

সর্দার বলিয়া উঠিল—আরে রাম কহো, রাম কহো !

তখন সে উত্তর দিক্‌গামী কাহ্নাইয়াকে তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে আদেশ করিল।

কাহ্নাইয়া বলিল—সর্দার, দুঃখের কথা আর কি বলিব ? কিছু দূর যাইবার পরে দেখিলাম, নদীর ধারে একটা লোক ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে। মাছ ধরিতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবু ভাবিলাম, দেখাই যাক, লোকটা কি বলে! শুধাইলাম—কি করিতেছ ?

সে বলিল—মাছ ধরিতেছি।

সর্দার, দিল্লী হইলে সে কি স্বীকার করিত? নিশ্চয়ই বলিত, জল মাপিতেছি বা ঐ রকম আর একটা কিছু।

সর্দার, যে দেশের লোক অকারণে সত্য কথা বলে, সে দেশে কোন্ সুখে থাকিব ? হয় তো ইহাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমরাও শেষে সত্য কথা বলিতে সুরু করিয়া দিব। মনের দুঃখে চলিয়া আসিলাম।

সর্দার আবার বলিয়া উঠিল—আরে রাম কহো, রাম কহো !

তখন সকলে সর্দারকে তাহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে অনুরোধ জানাইল।

সর্দার সুরু করিল—আমি পূব দিকে গিয়াছিলাম। ক্রোশখানেক পথ গিয়া একটা সহর দেখিলাম। আরে ছোঃ, সে কি সহর! গোটাকয়েক কোঠাবাড়ী, আর সব খড়ের চালা।

সেখানে একটা বাজার আছে দেখিতে পাইলাম। সারি সারি দোকান, চাল-ডাল, কাপড়-চোপড় সাজানো, কিন্তু সব দোকানে দোকানী নাই। লোকে পছন্দমতো জিনিষ তুলিয়া লইয়া দাম রাখিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

তাহার কথা শুনিয়া ঠগেরা সকলে হায় হায় করিয়া বুক চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিল—এ কোথায় আসিলাম !

সর্দার বলিতে লাগিল—যত বাড়ী-ঘর দেখিলাম, কোনটার দরজায় কুলুপ-চাবি নাই, সব খোলা পড়িয়া আছে, অথচ শুনিলাম, কোন জিনিষ কখনো চুরি যায় না !

—কেমন করিয়া জানিলে ?

—একটা লোককে শুধাইয়াছিলাম কি না ! তাহারা কখনো চাবি-কুলুপ দেখে নাই, এমন কি, সে বস্তুর নাম পর্যন্ত শোনে নাই। অথচ দিল্লীর কথা ভাবিয়া দেখো, দরজায় চাবি-কুলুপ দিয়াও নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই, পাহারা বসাইতে হয়।

—লোকটাকে তাহার নাম শুধাইলাম, সে বলিল—জগা !

—সত্য বলিল যে, তাহার প্রমাণ কি ?

—আরে মিথ্যা করিয়া বলিবার মতো বুদ্ধি আছে কি ? তাহা হইলে আর ভাবনা কি ছিল ? দেখিলাম, আর পাঁচ জনেও তাহাকে জগা বলিয়াই ডাকিতেছে।

—তাহাকে একান্তে ডাকিয়া বলিলাম, তোমার নাম জগা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা বলিলে কেন ?

—সে বলিল—তবে কি বলিব ?

—ঠগা বলিবে, লগা বলিবে, রামা বলিবে, জগা ছাড়া আর যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিবে !

—সে বলিল—কেন ?

—অযথা সত্যকথা বলিলে প্রয়োজনকালে যে মিথ্যা বলিতে পারিবে না।

সে শুধাইল, মিথ্যা কি ?

—শোনো একবার কথা—মিথ্যা কি ? মিথ্যা কি নয় ? তাহাকে বলিলাম—বাপু, মিথ্যার মহিমা অত সহজে বুঝাইতে পারিব না, তবে এখন এইটুকু জানিয়া রাখো যে, যে মিথ্যা বলিতে পারে, সে সবই পারে !

—দেখিলাম, লোকটার মধ্যে সম্ভাবনা আছে। সে বলিল, তবে আমাকে মিথ্যা বলিতে শিখাইয়া দাও।

আমি বলিলাম—নিশ্চয়ই শিখাইব, সেই জন্যই তো সুলতান আমাদের এখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন। লোকটা কাল সকালে এখানে আসিবে।

সর্দারের কথা শুনিয়া সকলে খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

সর্দার বলিল—আমরা এক বৎসর কাল এখানে থাকিব। যদি এই সময়ের মধ্যে গৌড়ের লোক মিথ্যা, জাল, জুয়াচুরি, রাহাজানি প্রভৃতি শিখিয়া লয়, তবেই এ দেশে থাকিয়া যাইব, নতুবা সকলে দিল্লী ফিরিব, তাহাতে সুলতান আমাদের হাতেই মারুন আর ভাতেই মারুন।

সকলে বলিল—ইহা নিতান্ত সমীচীন সিদ্ধান্ত।

তখন সকলে প্রভাত ও জগার আশায় ঘুমাইয়া পড়িল।

৪

পরদিন যথাসময়ে প্রভাত ও জগা দেখা দিল।

জগা সর্দারকে বলিল—এবার আমাকে মিথ্যা কথা বলিতে শিখাও।

সর্দার বলিল—বহুৎ আচ্ছা! তোমার উৎসাহ দেখিয়া খুশী হইয়াছি। এখন মন দিয়া পাঠ লও। মিথ্যা কথার প্রথমটাই কঠিন, তারপরে ইহার মতো সহজ ব্যাপার আর নাই।

অতঃপর সর্দার ও জগার মধ্যে যে-রকম কথোপকথন হইল, তাহার কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

সর্দার। আমার হাতে কয়টা আঙ্গুল?

জগা। পাঁচটা।

সর্দার। ওটা সত্য কথা হইল। উহা সকলেই জানে।

জগা। তবে কি বলিব?

সর্দার। হয় ছয়টা বলিবে, নয় তিনটা, কি চারটা বলিবে।

জগা। কেন?

সর্দার। কেন আবার কি! সেটাই যে মিথ্যা হইল, তাহাই শিখিতে তুমি যে আসিয়াছ।

জগা। মিথ্যা কাহাকে বলে?

সর্দার। সত্য ছাড়া আর যাহা বলিবে, তাহাই মিথ্যা।

জগা। তবে লোকে মিথ্যা বলে না কেন ?

সর্দার। তোমাদের এই পাণ্ডববর্জিত দেশ ছাড়া আর সব দেশেই মিথ্যা বলে।

জগা। আমরাই বা মিথ্যা বলি না কেন ?

সর্দার। সদ্‌গুরুর এবং বুদ্ধির অভাব।

জগা। মিথ্যা বলিলে কি হয় ?

সর্দার। কি না হয় !' মিথ্যা না বলিলে জাল-জুয়াচুরি, রাহাজানি, কিছুই সম্ভব নয়।

জগা। ও সব কি ?

সর্দার। সময়ে শিখিবে, আগে মিথ্যাটা আয়ত্ত করিয়া লও।

জগা। প্রস্তুত আছি।

সর্দার। এবার বলো, আমার হাতে কয়টা আঙ্গুল ! বিবেচনা করিয়া উত্তর দিও।

জগা। আটাশটা।

সর্দার। বহুৎ আচ্ছা। এবার বলো, তোমার নাম কি।

জগা। ঠগা।

সর্দার। আবার বলো, তোমার নাম কি ?

জগা। ঐ তো বলিলাম—ঠগা।

সর্দার। উঁহু, হইল না।

জগা। কেন ?

সর্দার। কেন কি ! একই মিথ্যাকে একাধিক বার বলিলে তাহা প্রায় সত্য হইয়া পড়ে—অতএব প্রত্যেক বারে নূতন নূতন মিথ্যা বলিবে।

জগা। বেশ, তবে আমার নাম লগা।

সর্দার। এই তো চাই। কে বলিল, গৌড়ের লোক নির্ব্বোধ ! কেবল সদ্‌গুরুর অভাব। এবার আমরা আসিয়াছি, সে অভাবও আর থাকিবে না। আচ্ছা, বলো তো—সূর্য্য কোন্ দিকে ওঠে ?

জগা। কখনো দক্ষিণে, কখনো পশ্চিমে, কখনো উত্তরে।

সর্দার। কখনো পূবে নয় কেন!

জগা। ওদিকে যে সত্যই ওঠে।

সর্দার। সে কথা ঠিক! কিন্তু অনেকগুলি মিথ্যার সঙ্গে মিশাইয়া বলিলে সত্যও মিথ্যার রঙ পায়! বরঞ্চ আসলটাকে বাদ দিলেই লোকে সন্দেহ করিবে।

জগা। বুঝিয়াছি।

সর্দার। বুঝিবেই তো, তুমি যে গৌড়বাসী। ভালো, তোমার নামটা কি?

জগা। খগা।

সর্দার। বাঃ বাঃ, বেশ!

জগা। সর্দার, তোমার শিক্ষাতে ইতোমধ্যেই মনে এক প্রকার আনন্দ অনুভব করিতেছি। এমন আর কখনো করি নাই।

সর্দার। তবে আজ আর প্রয়োজন নাই। কারণ, ঐ আনন্দই প্রমাণ করিতেছে যে, তোমার মনে সত্যের মূল উৎপাটিত হইয়া তৎস্থানে মিথ্যার অঙ্কুর মাথা তুলিয়াছে। এবারে তুমি গ্রামে ফিরিয়া যাও। কাল আবার আসিবে।

জগা যাইবার জন্য উদ্যত হইলে সর্দার তাহার হাতে এক জোড়া চাবি-কুলুপ দিয়া বলিল—এটা তুমি লইয়া যাও।

জগা। ইহা তো কখনো দেখি নাই?

সর্দার। মিথ্যাই কি আগে শুনিয়াছিলে?

জগা। ইহার নাম কি?

সর্দার। লোকে ইহাকে চাবি-কুলুপ বলে। কিন্তু আসল নাম 'শয়তানের বেড়ি'।

জগা। ইহার ব্যবহার কি?

সর্দার। আপনি জানিতে পারিবে। বিশেষ তোমার মনে যে অঙ্কুর গজায়মান, তাহারই পত্রে পত্রে ইহার ব্যবহার ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। চেষ্টা করিয়া পড়িয়া লইও, তবে আশা আছে যে, খুব বেশি চেষ্টা না করিলেও হইতে পারে।

সারা দিন সেখানে কাটাইয়া জগা সেই চক্‌চকে চাবি-কুলুপ জোড়া লইয়া সন্ধ্যাবেলা সানন্দে গ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিল।

৫

জগা ওরফে লগা, খগা, ঠগা ইত্যাদি রাত্রে শুইবার সময়ে তালা চাবি জোড়া দরজার শিকলের সঙ্গে ঝুলাইয়া রাখিল। এখানে বলা বাহুল্য যে, রাম সর্দার তালা-চাবির ব্যবহার শিখায় নাই—আর সেটা যে দরজার শিকলে ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও শিখায় নাই, ওটা জগার নিজেরই আবিষ্কার। সেটা ছিল জ্যোৎস্না রাত্রি। জগার পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী অনেক রাত্রে উঠিয়া দেখিতে পাইল, জগার বাড়ীর দরজার শিকলে কি একটা অদৃষ্টপূর্ব বস্তু জ্যোৎস্নায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সে নিকটে আসিয়া সেই অত্যুজ্জ্বল বস্তুটার দিকে মুগ্ধের ন্যায় তাকাইয়া রহিল! ওটা কি? জগা কোথায় পাইল? কি আশ্চর্য! কি সুন্দর! তখন তাহার মনে যে ভাবোদয় হইল, ইডেন উদ্যানে স্বর্ণ আপেল দর্শনে আদিম নারী ইভের মনোভাবের সঙ্গে তাহার বিস্ময়জনক সাদৃশ্য ছিল! বাস্তবিক ঐ পিত্তল-নির্মিত জ্যোৎস্না-জালে উজ্জ্বল তালা-চাবি জোড়া তো এক প্রকার সুবর্ণ আপেলই বটে! জগার মুগ্ধ প্রতিবেশীর চোখ লোভে জ্বলিতে লাগিল। তখন আদিম নারী ইভ যা করিয়াছিল, সেও তাহাই করিল, সেই অভিনব স্বর্ণময় আপেলটি পাড়িয়া লইয়া নিজ গৃহে আনিল। কোথায় রাখিবে? জগা যেখানে রাখিয়াছিল স্বগৃহের সেই শিকলে রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

তাহার পাশের বাড়ীর লোকটি কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া সেটি দেখিতে পাইল। সেও মুগ্ধ হইয়া সেটি খুলিয়া আনিয়া নিজ গৃহের শিকলে ঝুলাইয়া রাখিল। এমনি করিয়া পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী কর্তৃক অপসারিত হইয়া সেই সুবর্ণ আপেল এক রাত্রির মধ্যেই গ্রামান্তের গৃহে চলিয়া গেল।

ভোর বেলা জগা উঠিয়া তালা-চাবি দেখিতে না পাইয়া পাশের বাড়ীকে ধরিল। পাশের বাড়ী তাহার পাশের বাড়ীকে ধরিল। এই ভাবে ধরাধরির

ঢেউ চলিতে চলিতে সকলে আসিয়া গ্রামান্তের গৃহস্থের বাড়ীতে পড়িল। তখনো তাহার শিকলে তালা-চাবি জোড়া ঝুলিতেছিল। সে সব অপরাধ অস্বীকার করিয়া বলিল—এ তালা-চাবি কেমন ভাবে আসিল, সে কিছুই জানে না। তখন তালা-চাবি জোড়ার স্বত্ব লইয়া ঝগড়া ও মারামারি আরম্ভ হইল। যাই হোক, সাক্ষী-প্রমাণের জোরে জগা তাহার তালা-চাবি জোড়া ফিরিয়া পাইয়া সানন্দে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

তা করুক! কিন্তু ঐ তালা-চাবি জোড়া উপলক্ষ্য করিয়া গৌড় নগরে এক রাত্রে এক সঙ্গে মিথ্যা, চুরি, বাটপাড়ি প্রভৃতি প্রথম সংঘটিত হইল।

বিকালবেলা জগা ঠগদের আড্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিল। রাম সর্দার শুনিয়া পুলকিত হইয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—

এই তো ভাই, তোমরা সভ্যতা ও প্রগতির পথে চলিয়াছ—আর ভয় নাই।

তার পরে বলিল—এসো, তোমাকে তালা-চাবির ব্যবহার শিখাইয়া দিই।

এই বলিয়া চাবি দ্বারা কিরূপে তালা বন্ধ করিতে হয়, আর তালা-চাবি দুই দ্বারা কিরূপে দরজা বন্ধ করিতে হয়—সব জগাকে শিখাইয়া দিল। জ্ঞানবৃক্ষের ফলের আরও খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া জগা গৃহে ফিরিল।

তার পরদিন জগার মাতুলালয়ে যাইবার কথা। সে তালা-চাবি দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া, চাবিটা ট্যাঁকে গুঁজিয়া মাতুলালয়ে প্রস্থান করিল।

জগার প্রতিবেশী রাত্রে উঠিয়া দেখিল, জগার গৃহ সেই পূর্ব-দৃষ্ট বস্তু দ্বারা বন্ধ। সে দরজা ঠেলিল, খুলিল না। তখন সে ভাবিল, ঘরে নিশ্চয় কোন মূল্যবান্ বস্তু আছে, নহিলে দরজা বন্ধ করিবে কেন? এ দেশে তো দরজা বন্ধ করিবার প্রথা নাই। তখন কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া সে গৃহের ভিতে একটি সিঁধ কাটিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

পরদিন জগা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—দরজা বন্ধ, কিন্তু গৃহের ভিতে মনুষ্য-প্রবেশযোগ্য একটি গর্ত। সে রাম সর্দারকে গিয়া সব নিবেদন করিল।

রাম সর্দার পুনরায় তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—বাচ্চা, ঘাবড়াও মৎ, তোমরা সভ্যতার পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হইলে।

তার পরে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, ঐরূপ গর্তকে সিঁধ কাটা বলে, আর সিঁধ কাটিতে যাহারা জানে, তাহারাই প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ।

জগা বলিল—তবে আমিও সিঁধ কাটিব।

রাম সর্দার বলিল—অবশ্যই কাটিবে। এই বলিয়া সর্দার একখানা সিঁধ-কাঠি জগার হাতে দিল। কৃতজ্ঞ জগা সিঁধ-কাঠি লইয়া গৃহে ফিরিল।

এদিকে গৌড়বাসীরা জগার তালা-চাবি লাভের রহস্য জানিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা জনে জনে ঠগপত্তনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রত্যেকে এক জোড়া তালা-চাবি উপহার পাইয়া সানন্দে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

সকলে দরজায় তালা-চাবি লাগাইয়া নিশ্চিন্তে শুইত, কিন্তু সে নিশ্চিন্ত ভাব রাত্রি প্রভাত পর্যন্ত টিকিত না। কারণ, তাহারা ভোরের আলো দেয়ালে কর্তিত একটি গর্ত্তপথে আসিতে দেখিত।

সকলে গিয়া রাম সর্দারকে বলিত—সর্দার, এ কি ব্যাপার ?

সর্দ্দার প্রত্যেককে একটি করিয়া সিঁধ-কাঠি দিয়া বলিত, তুমিই বা পিছাইয়া থাকিবে কেন ?

বাস্তবিক জগা আগাইয়া যাইবে, আর তাহারা পিছাইয়া থাকিবে—এ হইতেই পারে না। তখন প্রতি গৃহে সিঁধ দেখা দিতে লাগিল এবং অচিরকাল-মধ্যে গৌড়বাসীরা সকলেই সিদ্ধপুরুষ হইয়া উঠিল।

৬

অতঃপর গৌড়ের পরিস্থিতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। প্রত্যেক গৃহস্থ যুগপৎ ঘরের অর্গল অধিকতর মজবুত এবং সিঁধ-কাঠি অধিকতর তীক্ষ্ণ করিতে লাগিয়া গেল; প্রত্যেকে যুগপৎ তালা-চাবি ও তালা ভাঙিবার যন্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল; এবং সময়ে সময়ে সকলেই ঠগ-পল্লীতে গিয়া প্রয়োজনমত

পরামর্শ লইয়া আসিতে সুরু করিল। অল্প কালের মধ্যেই গৌড়ের সে শান্তি, সে নিয়মানুবর্তিতা, জনগণের মধ্যে সে প্রীতি ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ, সাধুতা, লোভহীনতা ও সত্যবাদিতা কোথায় লুপ্ত হইল। এখন সর্বদাই সেখানে মারামারি, কাটাকাটি, চুরি, জুয়াচুরি, বাটপাড়ি, রাহাজানি লাগিয়াই আছে। এখন কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না, এখন কাহারো ধন-প্রাণ নিরাপদ্ নয়, সর্বদাই সকলের মনে যেমন নিদারুণ লোভ, মুখে-চোখে তেমনি উৎকট আশঙ্কা! একাধারে চোর ও চৌর্যের বিষয় হইলে যেমন হইয়া থাকে, তেমনি হইল।

শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, ঠগদের শিষ্যগৌরব ক্রমে শিষ্য-ভীতিতে পরিণত হইল।

ঠগেরা আসিয়া সর্দারকে ধরিল, বলিল,—সর্দার, এ কি করিলে? এখন যে প্রাণ বাঁচানো দায়!

রাম কাহেলী বলিল—কি হইয়াছে?

—কি হইয়াছে?

এক জন বলিল—কাল সন্ধ্যাবেলায় মাঠের মাঝে কে আমার মাথায় লাঠি মারিয়া সব কাড়িয়া লইয়াছে।

আর এক জন বলিল—পরশু রাত্রে আমার ঘরে সিঁধ কাটিয়াছে।

অপর এক জন বলিল—আমার গোরু চুরি গিয়াছে।

কেহ বলিল—আমার গ্রন্থিচ্ছেদ ঘটিয়াছে।

এক জন বলিল—আমার জোরুর নীবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে।

চার দিক্ হইতে এই রকম শত শত অভিযোগ উঠিল।

তখন রাম কাহেলী বলিল—এ সব তো অবিমিশ্র দুঃখের কারণ নয়, গৌরবেরও কারণ বটে।

—গৌরবের কারণ?

—নয় তো কি? শিষ্য গুরুকে অতিক্রম করিবার মতো হইয়াছে, ইহাতে কোন্ গুরু না গৌরব অনুভব করিবে?

এ উত্তরে কেহ খুশী হইল না।

কেহ কেহ বলিল—সর্দার, তোমার গায়ে হাত পড়ে নাই কি না, তাই গৌরবের দোহাই দিতেছ। নিজের গায়ে হাত পড়িলে তোমারও আমাদের মতো মনের অবস্থা ঘটিত! হাঁ, তখন বুঝিতাম, কেমন গুরুর গৌরব!

সর্দার বলিল—আচ্ছা, সেই পরীক্ষাই হোক। আমি সহরের দিকে চলিলাম, কাল ভোরে ফিরিয়া আসিব, ততক্ষণ তোমরা ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকো।

এই বলিয়া সর্দার সহরের দিকে চলিল। তখন সন্ধ্যা সমাগত।

৭

ভোরবেলা রাম কাহেলীর উল্লাস-ধ্বনিতে ঠগ-পল্লীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সকলে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সর্দার, ব্যাপার কি?

সর্দার বলিল—ভাই, রাম কহো, রাম কহো।

সকলে বলিল—তা না হয় কহিতেছি, ব্যাপার কি?

সর্দার। আমার জেব কাটা গিয়াছে।

সকলে। কই, দেখাও।

সর্দার। দেখো, এখন শীতকাল, গায়ে আমার মোটা জামা—

সকলে। তাহার জেব কাটিয়াছে?

সর্দার। সে তো অনেকেই পারে, তাহাতে কি এমন কৃতিত্ব?

—তবে?

সর্দার। আমার গায়ে তিনটি জামা, সব নীচেটার জেব কাটিয়াছে। তোমরা পারিতে কি?

সকলে। সাধ্য কি!

সর্দার। তবে?

—কাটিল কে?

সর্দার। আর কে? জগা। কাল সারা রাত আমি আর জগা গল্প করিয়া কাটাইয়াছি—তারই মধ্যে কখন্ যে কাজ হাঁসিল করিল, কিছুই টের

পাইনি! তার পরে সে বলিল—আজ সকালবেলা জগার গৃহত্যাগ করিয়া আসিবার সময়ে হঠাৎ হাত দিয়া দেখি, ফতুয়ার জেব অতলস্পর্শ! আর কি চাও? তোমরাই বলো, দিল্লীতে এমন পাকা হাত কয়টা আছে?

এক জন বলিল—সর্দার, তোমার কি দুঃখ হইতেছে না?

—দুঃখ? এমন যার শিষ্য, তার "কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ?"

—এখন কি করিবে?

—এ দেশেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করিব। স্বয়ং সুলতান ফিরাইয়া লইতে আসিলেও যাইব না।

সকলে স্বীকার করিল—সর্দার, তবে আমরাও যাইব না; কেন না, এখন আমরা শিষ্যদের কাছে পাঠ লইয়া হাত পাকাইব। আমাদের এখনো অনেক শিখিবার আছে।

সর্দার বলিল—মানুষের শিখিবার বয়স কখনো যায় না।

তার পরে সকলে মিলিয়া ফৌজদারের কাছে গিয়া বলিল,—সাহেব, তুমি এবার নিশ্চিন্তে দিল্লী ফিরিয়া যাইতে পারো—আমরা স্থায়ী ভাবে এখানেই থাকিলাম।

ফৌজদার শুধাইল—সুলতানকে গিয়া কি বলিব?

সর্দ্দার বলিল—বলিও যে, "তোমারে বধিবে যে, গৌড়ে বাড়িছে সে।"

ফৌজদার। ইহার অর্থ?

সর্দার। ভাবী কালের ইতিহাস ইহার অর্থ পরিষ্কার করিয়া বলিবে। এখন না-ই বলিলাম।

ফৌজদার নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। ঠগেরা স্থায়ী ভাবে গৌড়ে রহিয়া গেল—নড়িবার লক্ষণ দেখাইল না।

তার পরে কালক্রমে জলে জল মিশিয়া গেল। গৌড়ীয় ঠগ আর দিল্লীর ঠগ, দুইয়ে মিলিয়া গৌড়-বাংলার গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া তুলিতে লাগিল। এখনো সে অধ্যায় শেষ হয় নাই।

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ ৫৫, পংক্তি ১১

'জোয়ারের কাদাজলের মধ্যেই পারদ থাকে—যে চাঁদ তাকে আগিয়ে দেয়' স্থলে হইবে 'জোয়ারের কাদা জলের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে যে চাঁদ তাকে জাগিয়ে দেয়।'

পৃঃ ৫৬, পংক্তি ১৬

'হাস্যময়' স্থলে হইবে 'রহস্যময়'

পৃঃ ৫৭, পংক্তি ১৭

'কাজের' স্থলে হইবে 'বাজে'

পৃঃ ৫৮, পংক্তি ৬

'আর্য্যাটি' স্থলে হইবে 'অধ্যায়টি'

পৃঃ ৫৯, পংক্তি ১৫

'বই' স্থলে হইবে 'বর্হ'

পৃঃ ৬৪, পংক্তি ১৭

'কবিত্ব' স্থলে হইবে 'কবির'

পৃঃ ৬৬, পংক্তি ১২

'কার্য' স্থলে হইবে 'কাব্য'

পৃঃ ৬৯, পংক্তি ১৫

'কার্যের' স্থলে হইবে 'কাব্যের'

পৃঃ ৬৯, পংক্তি ২১

'কার্য্যের' স্থলে হইবে 'কাব্যের'

পৃঃ ৭০, পংক্তি ১১

'ঘুরাইয়া' স্থলে হইবে 'পুরাইয়া'

পৃঃ ৭১, পংক্তি ১৬

'বইটি' স্থলে হইবে 'বর্হটি'